মহান স্রষ্টার একত্ববাদ ও আধুনিক বিজ্ঞান

[বাংলা]

وحدانية الله عز وجل في ضوء المعارف الحديثة

[اللغة البنغالية]

লেখক : মুহাম্মদ উসমান গনি

تأليف: محمد عثمان غني

সম্পাদনা : আব্দুল্লাহ শহীদ আব্দুর রহমান

নুমান বিন আবুল বাশার

مراجعة:

عبد الله شهيد عبد الرحمن

نعمان بن أبو البشر

2011 - 1432

IslamHouse.com

সূচী পত্র

অভিমত

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

মহান স্রষ্টার একত্ববাদ ও আধুনিক বিজ্ঞান বইটির উপর মতামত প্রকাশ করার জন্য লেখক আমাকে অনুরোধ করেছেন। আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে এই বইটির পান্ডুলিপি পড়ে দু' চারটি কথা না লিখে পারলাম না। বৈজ্ঞানিক যুগে প্রতিদিন নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিস্কার হচ্ছে। কিন্তু আমার ভাবতে অবাক লাগে বিজ্ঞানের এই নব নব অনেক আবিস্কারের কথা আগেই কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে।

কুরআন মহান আল্লাহ পাকের তরফ থেকে মানুষের জন্য হিদায়েত ও পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থার একমাত্র সর্বশেষ ঐশী গ্রন্থ। এটি এমন একটি কিতাব যাতে আছে জীবনকে সুন্দর সহজ ভাবে সৎ পথে পরিচলার দিক-নির্দেশনাসহ জাতিগত, পারিবারিক, রাষ্ট্রীয় ও পরকালীন জীবনের বিস্তারিত নর্ণনা এবং দুনিয়া ও আখেরাতে সফলতা অর্জন করার উপায়। যেহেতু এটি একটি হিদায়েতের কিতাব কাজেই শিক্ষিত, অশিক্ষিত, ছোট, বড়, সাহিত্যিক, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, সর্ব যুগের সর্ব কালের লোকের জন্য শিক্ষার বিষয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল, পর্দাথ বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিজ্ঞান যে ষিয়েই পারদর্শী হোন না কেন উক্ত সর্ব বিষয়েই পবিত্র কুরআনে ইঙ্গিত রয়েছে বলে মানুষ হিদায়েত পেতে পারে। এব্যাপারে ২/১টি উদাহরণ তুলে ধরছি যাতে সবার কাছে তা সুস্পষ্ট হয়। সূরা কাহাফে আসহাবে কাহাফদের সম্পর্কে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন–

وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ . سورة الكهف : ١٨

"তুমি মনে করতে তারা জাগ্রত, কিন্তু তারা ছিল নিদ্রিত। আমি তাদেরকে পার্শ্ব পরিবর্তন করাতাম ডান দিকে ও বাম দিকে।[1]

এই সূরা, এমনকি কুরআনের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অধ্যায়ন করলে দীর্ঘ দিন ঘুমন্ত লোককে ডান দিকে ও বাম দিকে পরিবর্তন করানোর কথাটি বলার কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে হবে না। এতে না আছে পূর্বের বা পরের আয়াতের মিল, না আছে কোন প্রশ্নের উত্তর, আর না আছে কোন হিদায়েতের কথা। আপাতঃ দৃষ্টিতে মনে হবে এই কথাটি বলাই ছিল নিস্প্রয়োজন। কিন্তু না, তা কখনোই না। মহাজ্ঞানী আল্লাহ কি বিনা কারণে কুরআনের মত অহী গ্রন্থে এসব উল্লেখ করেছেন? আমি ডাক্তার হিসাবে এই আয়াতের অর্থ প্রথম পড়ার পর মনে হয়েছে সারা জীবন ও যদি সিজদায় পড়ে থাকি তাহলেও মানর জাতির জন্য এই শিক্ষার বিনিময় আদায়

[1] সূরা কাহাফ , ১৮।

করা অসম্ভব। আমি নিজের অজান্তেই আল হামদুলিল্লাহ, সুবহানাল্লাহ পড়ে কতক্ষণ যে নিশ্চুপ হয়েছিলাম তা মনে নেই। ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে বলি। মানুষের দীর্ঘ দিন অজ্ঞান (senseless) হয়ে পড়ে থাকা আবস্থায় যদি পার্শ্ব পরিবর্তন করানো না হয় তাহলে শরীরের নীচের অংশে ঘা হয়ে পচন ধরে। এক চিকিৎসা বিজ্ঞানে (Bedsore) বলে। দীর্ঘ দিনের অজ্ঞান রোগীকে উপযুক্ত চিকিৎসা দিয়ে হয়ত রোগমুক্ত করা সম্ভব, কিন্তু(Bedsore) ভালো করা সম্ভব হয়ে উঠে না। এমনকি রোগী রোগমুক্ত হয়েও (Bedsore) এ মারা যায়। কাজেই ডাক্তারের কাছে অজ্ঞান রোগীকে পার্শ্ব পরিবর্তন করানোটা কত যে মূল্যবান তা বুঝতেই পারেন। সে ই কারণে আমরা অজ্ঞান রোগীর জন্য নেই ঘন ঘন পার্শ্ব পরিবর্তন করার (Special care). ভাবতে কেমন লাগে যে, চিকিৎসা বিজ্ঞানের আবিস্কারের অনেক আগেই অজ্ঞান রোগীকে পার্শ্ব পরিবর্তনের নির্দেশ দিচ্ছেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা । এই ব্যাপারটি আপনারা কিভাবে নিবেন তা আপনাদের বিবেকের উপর ছেড়ে দিলাম। আর একটি উদাহরণ দিচ্ছি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সূরা আল-কাসাসে ঘোষণা দেনঃ

إِنْ جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فيه. سورة القصص: ٧٢

অর্থ: আল্লাহ যদি দিবসকে কেয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী রাখেন, আল্লাহ ব্যতীত এমন উপাস্য আছে কি যে তোমাদের জন্য রাত্রির আবির্ভাব ঘটাতে সক্ষম? [1]

পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে লাটিমের মত (লাটিম যেমন নিজের অক্ষের উপর ঘুরে, আবার দৌড়ায়ও) ঘুরে বলেই দিন, রাত্রি ও ঋতুর পরিবর্তন হয়। কিন্তু পৃথিবী যদি সূর্যের দিকে আজীবন একই দিকে মুখ করে ঘুরত তাহলে একদিক হতো চিরদিনের জন্য শুধু গরম আর গরম , আর অন্যদিক হতো অন্ধকার (রাত্রি) এবং ঠান্ডা আর ঠান্ডা। অথবা পৃথিবীর যে দিকে সূর্য আছে তার অপর দিকে যদি আরও একটি সূর্য থাকত তাহলে পৃথিবী যেভাবেই ঘুরত না কেন, সব সময়েই পৃথিবীর সম্পূর্ণ পৃষ্ঠ থাকত আলোকিত এবং গরম আর গরম। এই উভয় অবস্থাতেই পৃথিবীতে কোন জীব জন্তুর বসবাস করা সম্ভব হত না , যেমন চাঁদে কোন দিনই মানুষের পক্ষে বসবাস করা সম্ভব হবে না । কারণ একেতো ওখানে বাতাস নেই, অধিকন্তু সব সময়েই একদিক পৃথিবীর দিকে মুখ করে ঘুরে বলে চাঁদের এক পৃষ্টের তাপমাত্রা ১১৭oc, আর অন্য পৃষ্ঠের তাপমাত্রা (-) ১৩৬-oc। অতএব এক পৃষ্ঠে অতি গরম,

[1] সূরাতল কাসাস,৭২।

আর অন্য পৃষ্ঠে অতি ঠান্ডা বিধায় মানুষের বসবানের অনুপযোগী। প্রশ্ন উঠতে পারে যে, নভোচারীরা কি করে চাঁদে ঘুরে এলো? নভোচারীরা যে পোশাক পরিধান করে চাঁদে ভ্রমন করেছিলেন তা চাঁদের আবহাওয়ায় ক্ষতি করতে পারে না। এই ধরণের পোশাক পরে মানুষ কিছু দিন থাকতে পারে, কিন্তু দীর্ঘ দিন থাকতে পারবে না। এরই মধ্যে অক্সিজেন, খাওয়া দাওয়া, টয়লেট, সব কিছুর সুযোগ সুবিধা বিদ্যমান। আর বর্তমানে এর মূল্য ১০ মিলিয়ন ডলার (প্রায় ৫৭ কোটি টাকা)। চাঁদে বসে এই পোশাক পরিবর্তন ও করতে পারবে না। পরিবর্তন করতে গেলেই সে মারা যাবে।
আমাদের পৃথিবী একটি গ্রহ। এই গ্রহের মত অরেক গ্রহ আছে যেখানে কোন রাত্রি নেই। এমনি একটি উদাহরণ হলো Betacygni যার দুটি সূর্য এবং Alpha genitic যার সূর্যের সংখ্যা ৩টি। অতএব পৃথিবী যদি উপরোক্ত অবস্থায় পতিত হতো তাহলে আমাদের অবস্থা কি হতো, একটু ভেবে দেখবেন কি?
যাহোক লেখক বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের কথা উল্লেখ করে সুন্দর সাবলিল ভাষায় আল্লাহর একত্ববাদ ও রহমাতের উদাহরণ দিয়ে একটি মহৎ কাজ করেছেন। আমি আশা করি, পাঠকবৃন্দ বইটি পড়ে খুবই উপকৃত হবেন এবং হিদায়েতের পথ খুজে পাবেন।

ডাঃ শাহ মোঃ হেমায়েত উল্লাহ
প্রাক্তন মেডিকেল অফিসার ,
মিডফোর্ড হাসপাতাল , ঢাকা।
প্রাক্তন মেডিকেল সুপার ভাইজার ,
জেদ্দা মিউনিসিপালিটি, সৌদী আরব।

অভিমত

বিসমিল্লাহির রাহ মানির রাহিম

মহান রাব্বুল আলামীন এই সুন্দর পৃথিবী সৃষ্টি করে তাকে সুশোভিত করেছেন সৃষ্টি করেছেন অরণ্য, গাছপালা–তরুলতা, সাগর–নদী, আকাশ-বাতাস, চন্দ্র–সূর্য ও বিভিন্ন প্রকার প্রাণীকূল। আর এই সৃষ্ট জগতে মানুষকে পাঠিয়েছেন আশরাফুল মাখলুকাত রূপে। স্রষ্টার এই সুন্দর সৃষ্টি পরিচালিত হচ্ছে সুশংখল নিয়ম নীতি মেনেই । এই মহাবিশ্বের প্রক্রিয়মান সকল সৃষ্টির আবর্তনের প্রক্রিয়ায় যেন কোন ছন্দহীনতা নেই। প্রক্রিয়মান এই পরিচালন পদ্ধতি যেন এক সুশৃংখল বৈজ্ঞানিক আবর্তে বিবর্তিত হচ্ছে। এ যেন এক মহান প্রজ্ঞাসয় ও বিজ্ঞানময় স্রষ্টার সুনিপুণ সৃষ্টিশৈলীর বৈজ্ঞানিক মেলা, যার মধ্যে চিন্তাশীল ব্যক্তিদের জন্য রয়েছে নিদর্শন।

إِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَابَّةٍ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿٤﴾ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنْزَلَ اللهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٥﴾

অর্থঃ আকাশসন্ডলী ও পৃথিবীতে নিদর্শন রয়েছে মুমিনদের জন্য তোমাদের সৃজনে এবং জীব জন্তুর বিস্তারে নিদর্শন রয়েছে দৃঢ় বিশ্বাসীদের জন্য রাত্রি ও দিবসের পরিবর্তনে, আল্লাহ আকাশ হতে যে বৃষ্টি বর্ষন দ্বারা পৃথিবীকে ওর মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত করেন তাতে এবং বায়ুর পরিবর্তনে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে।[১]

এতো গেল সৃষ্টিকূলের দৃশ্যমান প্রয়াসের কথা। অদৃশ্যমান পরিচালন পদ্ধতিতে ও রয়েছে মহান স্রষ্টার সুনিদির্ষ্ট বিজ্ঞানময় নিয়ন্ত্রণ। এ পর্যায়ে মানুষের নিজের শরীরের সৃষ্টি ও পরিচালন পদ্ধতির দিকেই নজর দেয়া যাক। কত বিস্ময়কর সুশৃঙ্খল কাঠামোতে মানব অবয়বকে তৈরী করে তার আভ্যন্তরীণ পরিচালন ও নিয়ন্ত্রন পদ্ধতিতে সংযোজিত হয়েছে বিজ্ঞানময় ছন্দময়তা, যার সামান্য ছন্দপতন মানবদেহের সুষ্ঠ অপরিহার্য পরিচালন পদ্ধতিকে হুমকির মুখোমুখি করে তোলে । যুগ যুগ ধরে মানুষ স্রষ্টার এই সৃষ্টিশৈলী সম্বন্ধে ভেবেছে। ভেবে ভেবে সে তার হৃদয়ের নিভৃত অলিন্দে এক একক মহান পরাক্রমশালী স্রষ্টার অস্তিত্বকেই উপলদ্ধি করেছে চরম ও পরম ভাবে । আপ্লুত হয়েছে এই মহান শক্তিধর স্রষ্টার অস্তিত্বের পরশে স্নাত হয়ে উপলদ্ধির চরম পূর্ণতা পেতে। তাই তো ইব্রাহিম (আঃ) এর কাহিনী বর্ণিত হযেছেঃ

---

[1] সূরা জাসিয়া ৩-৫।

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي (سورة البقرة ٢٦٠)

অর্থ ঃ যখন ইব্রাহিম বলেছিল: হে আমার রব! আপনি কিরূপে মৃতকে জীবিত করেন তা আমাকে প্রদর্শন করুন। তিনি বললেন ঃ তাহলে কি তুমি বিশ্বাস করনা? সে বললো ঃ হ্যাঁ অবশ্যই, কিন্তু তাতে আমার অন্তর পরিতৃপ্ত হবে।[1] সূরা বাকারা : ২৬০

অনুরূপভাবে মূসার (আঃ) কথাও অন্যত্র বর্ণিত হয়েছেঃ

قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ. سورة الأعراف : ١٤٣

অর্থঃ সে (মূসা) বলল: হে আমার রব! আপনি আমাকে দর্শন দান করুন। আল্লাহ বললেনঃ তুমি আমাকে আদৌ দেখতে পারবে না। তবে তুমি ঐ পাহাড়ের দিকে তাকাও। যদি ঐ পাহাড় স্বস্থানে স্থির থাকে তাহলে তুমি আমাকে দেখতে পারবে। অত:পর তার রব যখন পাহাড়ে জ্যোতিস্মান হলেন তখন তা পাহাড়কে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিলো। তখন মূসা সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে গেল । যখন তার চেতনা ফিরে আসে তখন সে বলল: আপনি মহিমাময় ! আপনার পবিত্র সত্তার কাছে আমি তওবা করছি, এবং আমিই সর্ব প্রথম ঈমান আনলাম।[2] কালের বিবর্তনে মানুষের জানার, বুঝার ও উপলদ্ধির পরিধি বিস্তৃত হয়েছে বহুগুণে। যতবারই যুক্তির কষ্টি পাথরে নিজের বিশ্বাসকে উপলদ্ধি করতে চেয়েছে ততবারই মহান স্রষ্টার একক অস্তিত্ব তার হৃদয়ের মনিকোঠায় ঠাই করে নিয়েছে । উপলদ্ধির আকাঙ্খায় বৈজ্ঞানিক গবেষণা উন্নত হয়েছে আধুনিক থেকে আধুনিকতর। মানুষের নিজের শরীরী বিজ্ঞানের জ্ঞান উপলদ্ধিও আবিস্কৃত রয়েছে বহুগুণে। বিজ্ঞান ভিত্তিক এই জ্ঞানের সুষমায় মানুষ উপলদ্ধি করেছে মহান স্রষ্টার অস্তিত্বকে পরম তৃপ্তিভরে। আধুনিক বিজ্ঞানের অগ্রগতি এতদূরই এগিয়ে যাচ্ছে যে, স্রষ্টার মানব সৃষ্টির বিভিন্ন সৃষ্টিকৌশলকে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় মূল্যায়ন করে নিজের বিশ্বাসকে আরো সুদৃঢ় করে নিচ্ছে। এ পর্যায়ে

[1] সূরা বাক্বারাহ, ২৬০।

[2] সূরা আরাফ ,১৪৩।

বিজ্ঞানের আধুনিক ক্লোনিং পদ্ধতির দিকে দৃষ্টি দিলে বুঝা যায় যে, ঈসা (আঃ) এর পৃথিবীতে পিতা ছাড়া আগমনকেও বিজ্ঞান নির্ভর যুক্তির মাধ্যমে একটি অবশ্যম্ভাবী স্রষ্টার সৃষ্টি নৈপুণ্যকে চূড়ান্ত সত্য বলে অলঙ্ঘনীয় ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এখানে ক্লোনিং পদ্ধতির অতি সামান্য মৌলিক বর্ণনা সংযোজন করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি। বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টায় কোলনিং এর মাধ্যমে 'ডলি' নামক ভেরার জন্ম কাহিনী মোটামুটি ভাকে শিক্ষিত সমাজের সকলেরই জানার কথা। এই প্রক্রিয়ায় যে কোন একটি জনন কোষের (Germ cell)DNA থেকে বংশগতির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বিস্তারকারী পদার্থ (Genetic Component) বের করে নেয়া হয় অনুরূপ বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন কোন প্রাণীর শরীর কোষ (Somatic cell) থেকে Genetic Component কে প্রতিস্থাপনেরমাধ্যমে নিষিক্তকরণ (Fertilisation) করে ভ্রুন কোষটি কোন জরায়ুর (Uterus) ভিতরে প্রবিষ্ঠ (Implantation) করা হয়। সেখানে ঐ জরায়ুর পরিবেশে ভ্রুন বেড়ে পূর্ণ প্রাণী জন্ম লাভ করে । এখানে উল্লেখ্য যে, ঐ প্রাণী যে জরায়ুর ভিতর বাড়তে থাকে সেই জরায়ুর ধারণকারী প্রাণীর কোন বৈশিষ্ট্য সৃষ্ট প্রাণীটির ভিতরে পরিলক্ষিত হয় না। Simatic কোষের যে Genetic component প্রতিস্থাপিত হয়েছিল নতুন জীবটি ঐ বৈশিষ্ট্যেরই হয়। এই প্রক্রিয়ায় কোন যৌন মিলনের প্রয়োজন হয় না অর্থাৎ পুরুষের সক্রিয় ভূমিকা ছাড়াই জীবের অস্তিত্বের আবির্ভাব ঘঠে । এই প্রক্রিয়ায় একই বৈশিষ্ট্যের অনেকগুলো মানব সন্তান একই সময় সৃষ্টি করা সম্ভব বলে আধুনিক বিজ্ঞান দাবী করছে, যদিও নৈতিক কারণে পৃথিবীর মানবকুল এখনো এর কোন আইনগত বৈধতা প্রদান করেনি। এই বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ থেকে পিতা ছাড়া ঈসা (আঃ) এর জন্ম রহস্যের সত্যতার যর্থাথতা প্রমাণিত হয়, যেখানে কেবলমাত্র মহা পরাক্রমশালী বিজ্ঞানময় আল্লাহর সামর্থ্যকেই প্রতিষ্ঠিত করে। এমন কি বর্তমান বৈজ্ঞানিকগণ ধারণা করছেন যে, কোন মৃত প্রাণীর DNA কে এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ঐ প্রাণীর বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন হুবহু প্রতিরূপ সৃষ্টি করা সম্ভব হতে পারে। কারণ প্রাণী মারা গেলেও DNA এর মৃত্যু হয় না । বিজ্ঞানের এই (Hypothesis) পরাক্রমশালী স্রষ্টার পরকালে প্রাণীকুলের পুনঃ উত্থানের যৌক্তিক বিশ্লেষণ ছাড়া আর কি বলা চলে? মোট কথা, বিজ্ঞানের পুরাতন বা নতুন সকল আবিষ্কারের মধ্যেই মহান স্রষ্টার সৃষ্টিশৈলীর যৌক্তিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে তার একক অস্তিত্বকে পরম ও চরমভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব যা মানুষের ঈমানের দৃঢ়তাকে করে তোলে অতি সমৃদ্ধশালী। অবশ্য অবিশ্বাসীদের কথা আলাদা।

মাওলানা মুহাম্মাদ ওসমান গনি সাহেব তার আলোচ্য 'মহান স্রষ্টার একত্ববাদ ও আধুনিক বিজ্ঞান' গ্রন্থটিতে মানব দেহের বিভিন্ন অঙ্গ- প্রত্যঙ্গের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে স্রষ্টার সৃষ্টিশৈলীর সুনিপুণ বিজ্ঞানময় বিন্যাসের আলোচনার মাধ্যমে এক সাথে আল্লাহর একক অস্তিত্বকে মানব চিন্তার পরম উপলব্ধিতে চরম আলোড়ন সৃষ্টিতে প্রয়াসী হয়েছেন। আমি তার গ্রন্থের পান্ডুলিপি খানি দেখার সুযোগ পেয়েছি যার মাধ্যমে আমার মনে হয়েছে, ঈমানদার মানুষের কাছে পুস্তক খানি বিশেষ গুরুত্বের সাথে গৃহীত হবে, যার মাধ্যমে মানুষ তার ঈমানের পরিধিকে প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে নিজেকে পরকালের মুক্তির প্রচেষ্টায় ব্রতী করতে পারবে। বাংলা ভাষায় এরূপ বিজ্ঞান নির্ভর পুস্তকের সংখ্যা খুবই কম। মাওলানা মুহাম্মাদ ওসমান গনির উক্ত গ্রন্থ এ স্থলে কিছুটা হলেও জ্ঞান নির্ভর পুস্তকের ভান্ডারকে সমৃদ্ধশালী করে তুলবে। তার পুস্তকের বিষয়বস্তু ও বর্ণনা শৈলীও প্রাঞ্জল। আমি তার এ ধরণের লিখনশৈলীর অধিকতর বিকাশের জন্য পরম করুণাময়ের নিকট একান্তভারে প্রার্থনা করছে। আমিন !

ডাঃ মোঃ সাইদুল আলম

পরিচালক, স্বাস্থ্য বিভাগ,

আর্ন্তজাতিক ইসলামী ত্রাণ সংস্থা,

বাংলাদেশ অফিস।

'পাঠ কর তোমার রবের নামে ।' সূরা আলাক ০১।

ভূমিকা

أَلْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى أَشْرَفِ الأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَعَلَى أَلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ . أَمَّا بعد.

সর্বপ্রথম সেই মহান করুণাময় আল্লাহ তাআলার সার্বিক প্রশংসা যিনি আমাদের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ নবী প্রেরণ করেছেন এবং সর্ব উৎকৃষ্ট কিতাব দান করেছেন এবং পরিপূর্ণ শরীয়ত প্রদান করেছেন। সেই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর দরূদ ও সালাম যিনি আমাদেরকে সঠিক পথ দেখিয়েছেন এবং অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে এসেছেন।

বর্তমান পৃথিবীর এক পঞ্চমাংশ মানুষ মুসলিম হলেও প্রকৃত মসলিম ও ঈমানদারের সংখ্যা উপরোল্লিখিত অংকের যে বহু গুণ নীচে তা অস্বীকার করার উপায় নেই। কারণ অনেক লোক নাম দিয়ে ইসলাম ও ঈমানের দাবী করলেও প্রকৃত অর্থে তারা শিরকের বেড়াজাল থেকে নিজেদের মুক্ত করতে পারেনি।

আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ . يوسف : ١٠٦

অর্থঃ অনেক মানুষ 'আল্লাহকে বিশ্বাস করলেও তারা কিন্তু মুশরিক'[1]

অতএব মানুষের সর্ব প্রথম অবশ্য করণীয় কাজ হচ্ছে জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে সে আল্লাহর পরিচয় লাভ করবে । আল্লাহ তাআলা বলেন :

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ

অর্থ: জেনে রাখুন! আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই ।[2]

সাথে সাথে সে তার প্রভুর রাসূলের পরিচয় লাভ করবে যাতে তার ইয়াকীন বৃদ্ধি পায়, ঈমান শক্তিশালী হয় । আল্লাহ তাআলা বলেন:

أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَايَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ . الرعد ١٩ :

অর্থ: যে ব্যক্তি জানে যে, যা কিছু পালনকর্তার পক্ষ থেকে আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তা সত্য সে কি ঐ ব্যক্তির সমান যে অন্ধ? তারাই বোঝে যারা বোধশক্তি সম্পন্ন।[1] ।

---

[1] সূরা ইউছুফ,১০৬।

[2] সূরা মুহাম্মদ ১৯।

সে আরও জেনে নিবে যে, কেন তাকে এ পৃথিবীতে সৃষ্টি করা হয়েছে? তার সৃষ্টির রহস্য ও উদ্দেশ্য কি? তার গন্তব্য স্থান কোথায়? কোথায় সে চলছে? এ পৃথিবীতে যেহেতু অবস্থান করতেই হচ্ছে তাহলে কি ভাবে অবস্থান করবে?

সর্ব প্রথম যে ওহী মুহাম্মদসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর অবতীর্ণ হয়েছিল তা হচ্ছে:

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿١﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿٢﴾

' পাঠ করুন আপনার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন, যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন জমাট বাধা রক্ত থেকে।[2]

কোন আকস্মিক দুর্ঘটনার ফলে এ পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত লাভ করেনি, বরং মহান সৃষ্টা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানব সৃষ্টি করেছেন। তারপর এ মানব তারই দিকে প্রত্যাবর্তিত হচ্ছে। আল্লাহ তাআলা বলেন:

هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

' তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে বিস্তৃত করেছেন এবং তারই কাছে তোমাদেরকে সমবেত করা হবে।[3]

এই পৃথিবীতে অবস্থানের মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি বলেন:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

'আমি জিন ও মানব জাতিকে এবাদত ব্যতীত অন্য কোন কাজের জন্য সৃষ্টি করিনি।'[4]

কিভাবে অবস্থান করবে সে সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন:

فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

'অতঃপর তোমাদের নিকট আমার পক্ষ থেকে হিদায়েত পৌছবে, তবে যারা আমার সেই হিদায়েত অনুসারে চলবে, বস্তুত : তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিত হবে না।'[5]

---

[1] সূরা রা'দ ১৯।
[2] সূরা আলাক, ১-২।
[3] সূরা মুলক , ২৪।
[4] সূরা জারিয়াত,৫৬।
[5] সূরা বাক্বারা , ৩৮।

বর্তমান যুগে চলছে বিজ্ঞানের বিস্ময়কর জাগরণ। সঠিক বিজ্ঞান চর্চার মাধ্যমে শত শত বিজ্ঞানী সেই মহান স্রষ্টার প্রতি ঈমান আনতে শুরু করেছে কারণ তারা তাদের গবেষণার মাধ্যমে প্রতিটি সৃষ্টির মাঝে স্রষ্টার একত্বের নিদর্শন পাচ্ছেন। কেনই বা পাবেন না, যেহেতু মহান স্রষ্টা জ্ঞানী লোকদেরকে গবেষণা ও বিজ্ঞান চর্চার প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছেন । তিনি বলেন:

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ

'মানুষের দেখা উচিত যে, কি বস্তু থেকে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে।'[1]

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ

'মানুষ তার খাদ্যের প্রতি লক্ষ্য করুক। '[2]

انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

'আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে কি রয়েছে তোমরা চেয়ে দেখ।' [3]

فَانْظُرْ إِلَى آَثَارِ رَحْمَةِ اللهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا

'অতএব তোমরা আল্লাহর রহমতের চিহ্ন দেখ, কিভাবে তিনি ভূমির মৃত্যুর পর ওকে পুনরুজ্জীবিত করেন।'[4]

أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللهُ مِنْ شَيْءٍ

'আকাশসমূহ ও পৃথিবীর ব্যবস্থাপনা এবং যা কিছু আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন সে সম্পর্কে কি তারা গভীর চিন্তা করে না ?[5]

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللهُ مِنْ شَيْءٍ

'তারা কি আল্লাহর সৃজিত বস্তু দেখেনা ?' [6]

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ

'তুমি বল, তোমরা দুনিয়াতে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড় এবং দেখ যে, সৃষ্টির সূচনা তিনি কিভাবে করেছেন ? '[1]

---

[1] সূরা তারিক,৫।

[2] সূরা আবাসা,২৪।

[3] সূরা ইউনুছ১০১।

[4] সূরা রূম, ৫০।

[5] সূরা আরাফ, ১৮৫।

[6] সূরা নাহাল , ৪৮।

এ ছাড়া ও মানুষের মধ্যে যারা জ্ঞানী, বিদ্বান ও চিন্তশীল তাদের নিকট আল্লাহ বিভিন্ন বস্তুর বর্ণনা ও যুক্তি পেশ করে পরিশেষে বলেছেন: এতে রয়েছে বহু নিদর্শন বুদ্ধিমান লোকদের জন্য। আবার কখনও বলেছেন চিন্তাশীল ব্যক্তিদের জন্য, জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য ও দৃষ্টি সম্পন্ন লোকদের জন্য ইত্যাদি।

উম্মূল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে আল্লাহর একত্ববাদের প্রমাণাদী কুরআন, হাদীস ও আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে যা বিশ্লেষণ করা হয়েছিল সেগুলো সত্যিই আমার হৃদয়ে আকর্ষণ সৃষ্টি করত: সুদৃঢ় হয়েছিল সারা জাহানের একমাত্র সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান এবং সেই সংক্রান্ত আলোচনার কিছু বিষয় সামনে রেখে বিভিন্ন কিতাব, পত্র পত্রিকার তথ্য ও বন্ধু বান্ধবের সহযোগিতা একত্রিত করে মহান স্রষ্টার একত্ববাদ ও আধুনিক বিজ্ঞান নামে বইটি আমার মাতৃভাষার পাঠক পাঠিকাবৃন্দের হাতে তুলে দিচ্ছি। মানুষ হিসাবে ভুল ত্রুটি হওয়াই স্বাভাবিক। তাই সম্মানিত পাঠক বৃন্দের নিকট আমার আকুল আবেদন কোথাও কোন ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে, অথবা সংযোজন বিয়োজনের প্রয়োজন মনে করলে দয়া করে আমাকে জানাবেন। ইনশাআল্লাহ আপনাদের সুপরামর্শ স্বাদরে গ্রহণ করা হবে।

পরিশেষে ঐ সব সহযোগী ও শুভাকাংখীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই যারা আমাকে সব কাজে সাহায্য করেছেন। তারা অনেকে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যই করেছেন বিধায় নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক। আল্লাহ তাদেরকে সর্বোত্তম প্রতিদান প্রদান করুন।

মুহাম্মদ ওসমান গনি

আধুনিক বিজ্ঞান ঈমানকে শক্তিশালী করে

আমাদের মাঝে অনেকেই ধারণা করে যে, ধর্মীয় বিশ্বাসের সবকিছুই কোন প্রমাণ ছাড়াই বিশ্বাস করা জরুরী। আসলে এ ধরণের কোন কথা ইসলাম বলে না । দ্বীনের প্রতিটি কাজের পিছনে রয়েছে যৌক্তিক ও বিজ্ঞান সম্মত কারণ। মানব রচিত ধর্মীয় বিশ্বাস কিংবা বিকৃত ধর্মের মাঝে এ ধরণের কথা প্রযোজ্য হলেও ইসলামে এ কথা মোটেই খাটে না । বুদ্ধির স্বল্পতা কিংবা দ্বীনি তত্ত্বের বিষয়াদি হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম না হওয়ার কারণে মনে এরূপ ধোকা লাগতে পারে, কিন্তু ইসলামী আকীদাহ ও বিশ্বাস এই অপবাদ থেকে বহু যোজন দূরে। বরং ইসলামী আকীদার প্রতিটি বিষয়ই বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাওহীদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন:

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ

---

[1] সূরা আনকাবুত, ২০।

অর্থ: জেনে রাখুন! আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই ।[1]
তাদের হয়তো জানা নেই যে, আল্লাহর তরফ থেকে কুরআনের যে আয়াতটি সর্ব প্রথম নাযিল হয়েছিল তাহল:

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

'তুমি পাঠ কর তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন ।[2]
এ আয়াতে পাঠ করা ওয়াজিব করা হয়েছে। আর পড়ালেখা করা বিজ্ঞান তথা জ্ঞান অর্জনের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ ধাপ। ইসলাম তার অনুসারীদেরকে জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষা করার ক্ষেত্রে আল্লাহর অনুগ্রহ লাভ করার ব্যাপারে শিখিয়ে দিয়েছে:

وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا

' বল, হে আমার প্রভু! আমার জ্ঞানের বৃদ্ধি সাধন কর ।'[3]
মহান রাব্বুল আলামীন আল্লাহ তাআলাই হচ্ছেন সমগ্র বিশ্বের একমাত্র স্রষ্টা, নিয়ন্ত্রক ও পরিচালক। এই বিশ্ব সৃষ্টি, নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনায় তার কোন অংশীদার নেই আধুনিক বিজ্ঞানের আবিস্কারের মাধ্যমে মানুষ যখন আল্লাহর সৃষ্টির মাঝে সুদৃঢ় সূক্ষ্ম সুনির্দিষ্ট সুবিন্যাস নিয়ম শৃঙ্খলা , অসঙ্গতি, অসামঞ্জস্য, তখনই সর্ব পরিকল্পনা আইন শৃঙ্খলার মাঝে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহর একত্ববাদের সাক্ষ্য দেখতে পায়।
আর সেই মুহুর্তেই তাদের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়:

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا

' হে আমাদের পরোয়ারদেগার ! তুমি এগুলো অনর্থক সৃষ্টি করনি। '[4]
আর তারা আল্লাহর সৃষ্টি জগত নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে বলেই তাদের প্রশংসা করে আল্লাহ তাআলা বলেন:

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ . آل عمران : ١٩١

'যারা দাঁড়িয়ে বসে ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবঅং আসমান ও যমীন সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা ও গবেষণা করে। '[1]

---

[1] সূরা মুহাম্মদ,১৯।
[2] সূরা আলাক, ০১।
[3] সূরা ত্বাহা , ১১৪।
[4] সূরা আলে ইমরান ১৯১।

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সৃষ্টি জগত সম্পর্কে চিন্তা গবেষণায় উৎসাহ প্রদান করেছেন। অপর দিকে বর্ণনা করেছেন।

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. فصلت: ٥٣

'অনতিবিলম্বে আমার কুদরত ও তাওহীদের নিদর্শনাবলী তাদেরকে দেখিয়ে দিব বিশ্বজগতে ও তাদের নিজেদের মধ্যে। ফলে তাদের কাছে ফুটে উঠবে যে, ইহা সত্য । আপনার পালনকর্তা সর্ব বিষয়ে সাক্ষ্যদাতা, এটা কি যথেষ্ট নয়?[2]

এ আয়াতের উদ্দেশ্য সম্পর্কে তাফসীরে[3] বর্ণিত হয়েছে যে, বিশ্বজগতের ছোট বড় সৃষ্টি তথা আকাশ, পৃথিবী ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী যে কোন বস্তুর প্রতি দৃষ্টিপাত করলে আল্লাহর অস্তিত্ব, তার সর্বব্যাপী জ্ঞান ও কুদরত এবং তাঁর একত্বের সাক্ষ্য দেয়। এর চেয়ে আরও নিকটবর্তী বস্তু স্বয়ং মানুষের প্রাণ ও দেহ। তার এক একটি অঙ্গ এবং তাতে কর্মরত সূক্ষ্ম ও নাজুক যন্ত্রপাতির মধ্যে তার আরাম ও সুখের বিস্ময়কর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এসব যন্ত্রপাতিকে এমন মযবুত করা হয়েছে যে, সত্তর আশিবছর পর্যন্ত ও ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। মানুয়ের গ্রন্থিসমূহে যে স্প্রিং লাগানো হয়েছে তা মানুষের তৈরী শক্ত মযবুত ধাতব ইস্পাত নির্মিত স্প্রিং ও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে খতম হয়ে যেত। মানুষের হাতের চামড়া এবং তাতে অংকিত রেখাও সারা জীবনে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। এ সব ব্যাপারে যদি সামান্য জ্ঞান বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিও চিন্তা ভাবনা করে তাহলে সে এ বিশ্বাসে উপণীত হতে বাধ্য হবে যে তার অবশ্যই একজন স্রষ্টা ও প্রতিষ্ঠাতা আছেন যাঁর জ্ঞান ও কুদরত অসীম এবং যাঁর কোন সমকক্ষ হতে পারে না । তাই নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, সৃষ্টি জগতের সঠিক জ্ঞান প্রকৃত স্রষ্টার প্রতি ঈমানকে শক্তিশালী করে ও ইয়াকীন বৃদ্ধি করে। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

[1] সুরা আলে ইমরান ১৯১।

[2] সূরা ফুসসিলাত, ৫৩।

[3] তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন , ১২০৯।

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. سورة الأنفال: ٢

'যারা বিশ্বসী তারা এমন যে, যখন আল্লাহর নাম নেয়া হয় তখন তাদের অন্তর ভীত হয়ে পড়ে আর যখন তারে সামনে আল্লাহর নিদর্শনসমূহ তুলে ধরা হয় তখন তাদের ঈমান বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং তারা স্বীয় পরওয়ারদিগারের প্রতি ভরসা করে।[1]

- তাওহীদের অর্থ
- তাওহীদের জ্ঞানের মর্যাদা
- তাওহীদের জ্ঞান লাভের উপকারিতা
- তাওহীদের জ্ঞান না থাকার কুফল
- তাওহীদ ছাড়া কোন আমল গৃহীত হবে না

তাওহীদের জ্ঞান

তাওহীদুল্লাহ অর্থ আল্লাহর একত্ববাদ। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার যাবতীয় পূর্ণাঙ্গ গুণাবলী ও সমস্ত জগত প্রতিপালনে তিনি এক এবং অদ্বিতীয় – এই বাক্য দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে স্বীকার করার সাথে সাথে সকল ইবাদতের মাধ্যমে একত্বের প্রমাণ দানকে তাওহীদ বলে।

মনের আশা আকাঙ্খা আর বাস্তবতা বর্জিত দাবীর নাম তাওহীদের বাস্তবায়ন নয়। বরং তাওহীদ প্রতিষ্ঠিত হয় অন্তরে এমন ঈমান, আকীদা এবং ইহসানের হাকীকত বদ্ধমূল করার মাধ্যমে যা সুন্দর চরিত্র, মহৎ ও নেক কাজের দ্বারা সত্যে পরিণত হয়।

عِلْمُ التَّوْحِيْدِ ইলমুত তাওহীদ ঐ ইলম বা জ্ঞানকে বলা হয় যা যুক্তি ও তথ্যপূর্ণ প্রমাণাদি ধর্মীয় বিশ্বাসকে এমন ভাবে সুদৃঢ় করে যাতে থাকে না কোনই সন্দেহ, মন হয় স্থির এবং হৃদয় প্রশান্তি লাভ করে।

যাবতীয় যুক্তি, তথ্য ও বৈজ্ঞানিক প্রমাণাদি এ তাওহীদেরই অপরিহার্যতার প্রমাণ পেশ করে।

তাওহীদের জ্ঞানের মর্যাদা

ইসলামী জ্ঞান সমূহের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে তাওহীদের জ্ঞান। কেননা তাওহীদ হচ্ছে দ্বীনের আসল বা মূল নীতি, তাওহীদ ব্যতীত কোন

[1] সূরা আনফাল ০২।

মুক্তি নেই, কোন কল্যাণ নেই, সুখ ও শান্তির কোন পথ নেই। নবী ও রাসূলগণ এই তাওহীদের প্রতি আহবান জানিয়েছেন। প্রত্যেক রাসূলই তাঁর জাতিকে বলেছেনঃ

اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ (سورة الأعراف:٥٩)

'তোমারা একমাত্র আল্লাহর ইবাদত কর এবং আল্লাহ ছাড়া তোমাদের আর কোন ইলাহ নেই।'[১]

আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ سورة النحل :٣٦ .

'আমি প্রত্যেক উম্মাতের মধ্যে রাসূল পাঠিয়েছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, আর তাগুতকে বর্জন কর।'[2]

মহাগ্রন্থ আল কুরআনে এ তাওহীদকে ফরয করা হয়েছে। আল কুরআনে বর্ণিত হয়েছেঃ

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. سورة محمد: ١٩

'তুমি জেনে নাও যে, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই'[৩]

আল কুরআন নিজেই তাওহীদের সবচেয়ে বড় কিতাব তাতে এমন কোন পৃষ্ঠা নেই যেখানে তাওহীদের আলোচনা নেই। এমন কি হিজরতের পূর্বে সুদীর্ঘ তের বছর যা মক্কায় নাযিল হয়েছে তার সম্পূর্নটাই তাওহীদের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

তাওহীদের জ্ঞান অর্জনে উপকারিতা

তাওহীদের সরচেয়ে বড় উপকারিতা হচ্ছে তাওহীদ বান্দার চির জাহান্নামী হওয়ার পথ রোধ করে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّاسِ مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَبْتَغِيْ بِذَالِكَ وَجْهَ اللَّهِ . رواه البخاري.

'আল্লাহ তাআলা এমন ব্যক্তির উপর জাহান্নামের আগুন হারাম করে দিয়েছেন যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলেছে।[4]

- তাওহীদবাদী ব্যক্তি পরিপূর্ণ হিদায়েত প্রাপ্ত হয় এবং দুনিয়া ও আখিরাতে পূর্ণ নিরাপত্তা সহ সার্বিক কল্যাণ লাভ করে ।
- আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি ও পুন্য লাভের একমাত্র উপায় হচ্ছে তাওহীদ।

---

[1] সূরা আরাফ, ৫৯।

[2] সূরা নাহল , ৩৬।

[3] সূরা মুহাম্মদ , ১৯।

[4] বুখারী ।

- কেয়ামাতেরদিনে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শাফায়াত লাভ হবে তাওহীদের কারণে।
- বান্দার হৃদয়ে যখন তাওহীদ পূর্ণতা লাভ করে তখন আল্লাহ তাআলা বান্দার অন্তরে ঈমানের প্রতি ভালবাসা দান করেন এবং কুফুরী, ফাসেকী এবং নাফরমানীকে তার জন্য ঘৃণার বস্তু বানিয়ে দেন।
- তাওহীদ বান্দাকে মাখলুকের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে আল্লাহর প্রকৃত গোলামে পরিণত করে।
- আল্লাহ তাআলা তাওহীদবাদীদের উপর থেকে দুনিয়া ও আখেরাতের অনিষ্টতা ও অকল্যাণ দূর করে দেন এবং সর্বোত্তম ও শান্তিময় জীবন দান করেন এবং তার গুনাহ ক্ষমা করেন ।
- যে ব্যক্তি নিজকে তাওহীদের উপর প্রতিষ্ঠিত করবে সে বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে।
- যে ব্যক্তি তাওহীদের স্বীকৃতিদান করবে এবং উহার দাবী অনুযায়ীআমল করবে তার হৃদয়ের মধ্যে খুঁজে পাবে এক অনাবিল প্রশান্তি। কেননা সে এক প্রতিপালকের ইবাদত করে এবং তিনি (আল্লাহ) কি চান এবং কিসে তিনি রাযী হবেন সে অনুপাতে কাজ করে এবং যে কাজে তিনি নারাজ হবেন তা থেকে বিরত থাকে।

তাওহীদের জ্ঞান না থাকার কুফল

- তাওহীদের সঠিক জ্ঞান না থাকলে কেউ মুসলিম ও মুমিন হতে পারবে না। যে ব্যক্তি তার সৃষ্টিকর্তার পরিচয় জানে না সে এই দুনিয়াবী জিন্দিগীতে অন্ধের ন্যায়। সে জানেনা, কেন তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে? এই পৃথিবীতে তার উপস্থিতির উদ্দেশ্য কি? তার হায়াত শেষ হয়ে যায় কিন্তু সে জানে না যে, এই জীবন কেন শুরু হয়েছিল ? পৃথিবী থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু সে জানেনা কেন সে এখানে প্রবেশ করেছিল ? আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ. سورة محمد:١٢

‘যারা কাফির তারা ভোগ– বিলাসে মত্ত থাকে এবং তারা আহার করে যেমন চতুস্পদ জন্তু আহার করে, তাদের বাসস্থান জাহান্নাম।’[1]

[1] সূরা মুহাম্মদ ১২।

তাওহীদের জ্ঞান না থাকার কারণে আকীদাহ ও আমল নষ্ট হয়ে যায়। আল্লাহর নাফরমানী ও গুনাহ বেশী হয়। অতঃপর যমীনে আল্লাহর শাস্তি নাযিল হয়। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ . الروم : ٤١

'স্থলে ও পানিতে মানুষের কৃতকর্মের কারণে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়ে। আল্লাহ তাদেরকে তাদের কর্মের শাস্তি আস্বাদন করান যাতে তারা ফিরে আসে।'[1]

- তাওহীদ জ্ঞান না থাকার কারণে মানুষ আল্লাহর সাথে শরীক বানিয়ে নেয়, পরকালে চিরস্থায়ী জাহান্নামী হয়ে যায়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন।

من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. رواه البخاري.

'যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা অবস্থায় মৃত্যু বরণ করবে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।' বুখারী ।

- তাওহীদের সঠিক জ্ঞান না থাকার কারণে ঈমানদার হতে পারে না। ঈমান না থাকলে আমল গৃহীত হয় না । আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا . سورة الفرقان ٢٣

'আমি তাদের কৃতকর্মের প্রতি মনোনিবেশ করব। অতঃপর সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকনায় পরিণত করব।[2]

তাওহীদ ছাড়া কোন আমল গৃহীত হবে না

যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে না , তাঁর একত্ববাদে বিশ্বাসী নয়, প্রতিদান পাওয়ার আশা করে না, শাস্তির ভয় করে না অথচ তারা ভাল কাজ করে, কিন্তু এই কাজে আল্লাহর সন্তুষ্টির আশা করে না। তাই তারা হালাল হারামের গুরুত্ব দেয় না। প্রকৃত সৃষ্টিকর্তার নির্দেশের পরওয়া করে না। রাসূলগণ যা নিয়ে এসেছেন তা শ্রবণ করে না । তাদের সতর্কবাণীর ভ্রুক্ষেপ করে না। এরপরও যদি তাদেরকে আল্লাহর আয়াত শ্রবণ করানো হয় তখন তারা ক্রীড়ার ছলে সেগুলো উপেক্ষা করে। আর এ জন্যই তারা তাদের ভাল কাজের বিনিময় পাবে না, আল্লাহর কাছে তা গ্রহণীয় নয়। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

---

[1] সূরা রূম, ৪১।

[2] সূরা ফুরকান , ২৩।

وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا . سورة الفرقان ٢٣

‘আমি তাদের কৃতকর্মের প্রতি মনোনিবেশ করব। অতঃপর সে গুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকনায় পরিণত করব।[1] অন্যত্র বর্ণিত হয়েছেঃ

مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ . سورة إبراهيم ١٨

‘যার স্বীয় পালনর্কতার সত্ত্বার অবিশ্বাসী, তাদের আবস্থা এই যে, তাদের কর্মসমূহ ছাই ভস্মের মত যা ঝড়ের দিনে বাতাসে প্রচন্ড বেগে উড়িয়ে নিয়ে যায়। যা তারা উপার্জন করে তার কিছুই তারা তাদের কাজে লাগাতে পারবে না। এটাই দূরবর্তী পথভ্রষ্টতা।’[2]

তিনি আরো বলেনঃ

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ . سورة النور ٣٩

‘যারা কাফির তাদের কর্ম মরুভূমির মরীচিকা সদৃশ। যাকে পিপাসার্ত ব্যক্তি পানি মনে করে। এমনকি সে যখন তার কাছে যায় তখন কিছুই পায় না এবং পায় সেখানে আল্লাহকে। অতঃপর আল্লাহ তার হিসাব চুকিয়ে দেন আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।[3]

অতএব কাফিরদের ক্রিয়াকর্ম বাহ্যত: সৎ হলেও তা আল্লাহর কাছে গ্রহণীয় নয়। তাই সব অর্থহীন ও অকেজো।

এ ব্যাপারটি আরও স্পষ্ট করার জন্য একটি উদাহরণ বর্ণনা করছি যা আবদুল মাজীদ ঝান্দানী স্বীয় কিতাবে উল্লেখ করেছেন।[4] এক ব্যক্তি একটি বড় বাগানে প্রবেশ করলো যার মালিক সে নয়। সে সেখানে বিভিন্ন ধরনের ফলসহ খাবার জিনিস দেখতে পেলো। অতঃপর বাগানের অভ্যন্তরে কিছু কাজ করতে শুরু করলো। কিছু গাছ উপড়ে ফেলছে, আবার কিছু গাছ রোপণ করছে।

অপর এক ব্যক্তি ঐ বাগানেই প্রবেশ করে নিজে নিজে বলছেঃ ‘এই বাগানের মালিক অথবা এই বাগানের দায়িত্বশীলের সাথে যোগাযোগ না করে আমি বাগানের ভিতরে

---

[1] সূরা ফুরকান, ২৩।

[2] সূরা ইব্রাহিম ১৮।

[3] সূরা নূর , ৩৯।

[4] কিতাবুত তাওহীদ, পৃষ্ঠা ১৪।

বিছুই করব না।' অতঃপর সে সেই বাগানের মালিকের সন্ধান করতে শুরু করলো। এদিকে বাগানের মালিকের প্রতিনিধি তাদের দু' জনের কাছে পৌঁছে গেল এবং প্রথম ব্যক্তির কাজকে সে ঘৃণা করলো এবং নিষেধ করলো। কিন্তু সে তার কথায় কোন কর্ণপাত না করে মালিকের অনুমতি ছাড়াই যা ইচ্ছা তাই করতে রাগলো।

আর দ্বিতীয় ব্যক্তিটি বাগানের মালিকের প্রতিনিধির নির্দেশ শ্রবণ করলো এবং তিনি যে ভাবে নির্দেশ দিয়েছেন সেই মোতাবেক কাজ করতে শুরু করলো।

এখন প্রশ্ন হলো: এই দুই ব্যক্তির মধ্যে কে পুরস্কার বা ভাতা পাবার উপযুক্ত? ঐ ব্যক্তি কি পুরস্কার পাওয়ার যোগ্যতা রাখে যে ব্যক্তি বাগানের মালিকের পরিচয় নেয়নি। এবং তার প্রতিনিধির কথা শুনেনি, বরং অমান্য করেছে? নিজের ইচ্ছায় যদিও বাগানের কিছু ভালো কাজ করেছে, কিন্তু বাগানের মালিক কি তাকে পুরস্কার দিবে?

কোন সন্দেহ নেই যে, প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তি এ কথা বলবে যে, যে ব্যক্তি বাগানের মালিকের নির্দেশ মেনে চলেছে এবং নির্দেশ মোতাবেক কাজ করেছে সেই পুরস্কার পাওয়ার হকদার।

এই পৃথিবীর অবস্থাও ঠিক তাই। এই পৃথিবী ও তাতে যা কিছু রয়েছে সব কিছুর মালিক হচ্ছেন আল্লাহ। নবী ও রাসূলগণ হচ্ছেন তাঁরই প্রতিনিধি। প্রকৃত মুমিন সেই ব্যক্তি যে তার প্রভুর নির্দেশ অনুযায়ী চলে। আর যে মুমিন নয় সে তার প্রভুর রাজত্বে আল্লাহর পরিচয় না নিয়ে, তাঁর অনুমতি ছাড়াই নিজের ইচ্ছা মত কাজ করতে থাকে এবং সাথে সাথে তার প্রভুর রাসূলগণ থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে।

মানব সৃষ্টি আল্লাহর একত্ববাদের বৈজ্ঞানিক প্রমাণ

বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির এ যুগে বাস করে বিজ্ঞানের অবদান ও চরম বিকাশ আল্লাহ প্রদত্ত মানব মস্তিস্কের বাস্তব প্রতিফল হিসাবে গ্রহণ করাই যুক্তি সংগত। তবে বিজ্ঞানের অপব্যবহারের বিরুদ্ধে সর্বদা বিবেককে জাগ্রত রাখতে হবে এবং তা প্রতিরোধের জন্য সোচ্চার হতে হবে। বিজ্ঞানের সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে যেমন প্রভুত কল্যাণ নিহিত, তেমনি এর অপব্যবহার অকল্যাণ ও সর্বনাশা ভবিষ্যৎকে তরান্বিত করবে বৈকি। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা সকল সৃষ্টিকে নিয়ে কিছু সময় চিন্তা ভবনা ও গবেষণা করার জন্য অর্থাৎ জ্ঞান বিজ্ঞান র্চচা করার বিষয়ে জ্ঞানীগণকে বারবার তাগিদ দিয়েছেন। প্রকৃত অর্থে বিজ্ঞান র্চচা করলে একজন

নিরহংকার মানুষ আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আনুগত্যশীল হতে বাধ্য হয়।[1] কেননা মহান স্রষ্টার শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি হচ্ছে মানুষ।

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ (سورة الإسراء ٧٠)

'নিশ্চয়ই আমি আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি।[২]
আর এই মানুষের মাঝে মহান সৃষ্টিকর্তার একত্ববাদের অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ . وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ . سورة الذاريات ٢٠-٢١

'বিশ্বাসকারীদের জন্য পৃথিবীতে নিদর্শনাবলী রয়েছে এবং তোমাদের নিজেদের মধ্যেও রয়েছে, তোমরা কি দেখনা? '[3]
প্রথম আয়াতের তাফসীরে বর্ণনা করা হয়েছে যে, 'এ স্থলে নিদর্শনাবলীর বর্ণনায় আকাশ ও মহা শূণ্যের সৃষ্টি বস্তুর কথা বাদ দিয়ে কেবল ভূ- পৃষ্ঠের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এটা মানুষের খুব নিকটবর্তী এবং মানুষ এর উপর বসবাস ও চলাচল করে। দ্বিতীয় আয়াতে এর চেয়ে অধিক নিকটবর্তী খোদ মানুষের ব্যক্তি সত্বার প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট করা হয়েছে এবং বলা হয়েছেঃ ভূ- পৃষ্ঠ ও ভূ-পৃষ্ঠের সৃষ্ট বস্তু ও বাদ দাও, খোদ তোমাদের অস্তিত্ব, তোমাদের দেহ ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে চিন্তা ভাবনা করলে এক একটি অঙ্গকে আল্লাহ তাআলার কুদরতের এক একটি পুস্তক হিসাবে দেখতে পাবে। তোমরা হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হবে যে, সমগ্র বিশ্বে কুদরতের যেসব নিদর্শন রয়েছে সে সব যেন মানুষের ক্ষুদ্র অস্তিত্বের মধ্যে সংকুচিত হয়ে বিদ্যমান রয়েছে। এ কারণেই মানুষের অস্তিত্বেকে ক্ষুদ্র জগৎ বলা যায়। সমগ্র বিশ্বের দৃষ্টান্ত মানুষের অস্তিত্বের মধ্যে স্থান লাভ করেছে। মানুষ যদি তার জন্ম লগ্ন থেকে মৃত্যু পর্যন্ত অবস্থা পর্যালোচনা করে তাহলে আল্লাহ তাআলাকে যেন সে দৃষ্টির সামনে উপস্থিত দেখতে পাবে।
কিভাবে এক ফোঁটা বীর্য বিভিন্ন ভূখন্ডের খাদ্য ও বিশ্বময় ছড়ানো সূক্ষ্ম উপাদানের নির্যাস হয়ে গর্ভাশয়ে স্থিতিশীল হয়? অতঃপর কিভাবে বীর্য থেকে একটি জমাট রক্ত তৈরী হয় এবং জমাট রক্ত থেকে মাংসপিন্ড প্রস্তুত হয়। এরপর কিভাবে তাতে অস্থি তৈরী করা হয় এবং অস্থিকে মাংস পরানো হয়? অতঃপর কিভাবে এই নিষ্প্রাণ পুতুলের মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করা হয় এবং পূর্ণাঙ্গ রূপে সৃষ্টি করে তাকে দুনিয়ার

---

[1] মাসিক সংস্কার ৯/৩৩।
[2] সূরা ইসরা ৭০।
[3] সূরা জারিয়াত ২০-২১।

আলো বাতাসে আনয়ন করা হয়? এরপর কিভাবে ক্রমোন্নতির মাধ্যমে এই জ্ঞানহীন ও চেতনাহীন শিশুকে একজন সুঠাম ও কর্মঠ মানুষে পরিণত করা হয় এবং কিভাবে মানুষের আকার আকৃতিকে বিভিন্ন রূপ দান করা হয়েছে যে, কোটি কোটি মানুষের মধ্যে একজনের চেহারা অন্যজনের চেহারা থেকে ভিন্ন ও স্বতন্ত্র দৃষ্টিগোচর হয়? এই কয়েক ইঞ্চির পরিধির মধ্যে এমন এমন স্বাতন্ত্র বজায় রাখার সাধ্য আর কার আছে? এরপর মানুষের মন মেজাজের বিভিন্নতা সত্ত্বেও তাদের একই মৌলিকত্ব সেই আল্লাহ তাআলার কুদরতের লীলা যিনি অদ্বিতীয় ও অনুপম।[1]

মহান আল্লাহ তাআলা ঐশী গ্রন্থ আল কুরআনে বর্ণনা করেনঃ

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ . خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ . سورة الطارق ٥-٦

'মানুষের দেখা উচিত কি বস্তু থেকে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে স্খলিত পানি থেকে।[2]

অত্যাধুনিক সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে প্রমাণিত যে, মানুষের দেহকোষ ২৩জোড়া বা ৪৬টি ক্রোমোজোম নিয়ে গঠিত। তম্মধ্যে ২২জোড়া দেহ গঠনের কাজ করে। বাকী ২৩তম জোড়া লিঙ্গ নির্ধারক ক্রোমোজোম (sex chromosoe)। এই ২৩তম জোড়া পুরুষের বেলায় xyএবং মহিলাদের বেলায়xxক্রোমোজোম নিয়ে গঠিত। সন্তান পিতার কাছ থেকেx অথবা Y এবং মায়ের কাছ থেকে x ক্রোমোজোম নিয়ে জন্ম গ্রহন করে। নিম্নে ছকের সাহায্যে উহা দেখানো হল।

[1] তাফসিরে মাআরিফুল কুরআন, ১২৯৫ পৃষ্ঠা।

[2] সূরা তারিক্ব, ৫-৬।

সন্তান যদি মায়ের কাছ থেকে x এবং পিতার কাছ থেকেও x ক্রোমোজোম নিয়ে জন্ম গ্রহণ করে তাহলে সন্তান হয় xx অর্থাৎ মেয়ে। আর যদি মায়ের কাছ থেকেx এবং পিতার কাছ থেকে Y ক্রোমোজোম প্রাপ্ত হয় তাহলে সন্তান হবে xy অর্থাৎ ছেলে।

আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى . مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى . النجم : ٤٥-٤٦

'নিশ্চয়ই তিনিই স্খলিত এক বিন্দু বীর্য থেকে পুরুষ ও নারী সৃষ্টি করেছেন।'[1]

আল্লাহ তাআলা আরো বলেনঃ

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ. يس ٣٦:

'পবিত্র তিনি, যিনি জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন প্রত্যেকটি জিনিসকে, এমনকি যমীন যা উৎপন্ন করে, তাদের নিজেদেরকে এবং তারা যা জানেনা তাও।'[2]

তাই এই শুক্রাণু ও ডিম্বাণু কখনও কোন পরিবেশেই একক ভাবে বিকাশ লাভ করে না এবং একক ভাবে নতুন জীবন্ত অস্তিত্বের জন্ম দিতে অক্ষম। শুক্রাণু ডিম্বাণুর মিলনের ফলে জীবনের অস্তিত্ব প্রকাশ পায়। মেয়ে হোক অথবা ছেলে হোক, প্রতিটি পূর্ণাঙ্গ ও জীবন্ত মানব কোষে ৪৬টি ক্রোমোজোম থাকে; অথচ শুক্রাণু অথবা ডিম্বাণু থাকে ২৩টি ক্রোমোজোম। এটা থাকে অসম্পূর্ণ। আর যৌন প্রজনন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এদের মিলন ঘটিয়ে ২৩+২৩=৪৬টি ক্রোমোজোম মাতৃ গর্ভে একটি নিরাপদ আধারে স্থাপন করতঃ পূর্ণাঙ্গ ও জীবন্ত মানব কোষ গঠন করা হয়। এ নিয়ম সুনিয়ন্ত্রিত, ভুল-ত্রুটিমুক্ত ও একটি পরিকল্পনার অধীন। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ. الرعد ٨ :

'আল্লাহ জানেন প্রত্যেক নারী যা গর্ভধারণ করে এবং গর্ভাশয়ে যা সংকুচিতও বর্ধিত হয় এবং আল্লাহর বিধানে প্রত্যেকটির জন্য নির্ধারিত রয়েছে একটি পরিমাপ'[3]

سُنَّةَ اللهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَبْدِيلًا . الفتح : ٢٣

---

[1] সূরা নাজম , ৪৫-৪৬।

[2] সূরা ইয়াসিন , ৩৬।

[3] সূরা রা'য়াদ ৮।

‘এটাই আল্লাহর নিয়ম যা পূর্ব থেকে চালু আছে। তুমি আল্লাহর নিয়মে কোন পরিবর্তন পাবে না।[1]

ডাঃ হেমায়েত মানব সৃষ্টিতে আল্লাহর কুদরত বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, একজন পুরুষ যখন স্ত্রী গমন করেন তখন তার থেকে যে বীর্য বের হয় সেই বীর্যে শুক্রাণুর সংখ্যা থাকে বিয়াল্লিশ কোটির মত। তিনি আরও বলেন, কোন পুরুষের থেকে যদি বিশ কোটির কম শুক্রাণু বের হয় তাহলে স্বাস্থ্য বিজ্ঞান মতে সেই পুরুষ থেকে কোন সন্তান হয় না। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো যে, পুরুষের স্ত্রী মিলনে বীর্যে যদি শুক্রাণুর সংখ্যা বিশ কোটির কম হয় তাহলে কেন সেই পুরুষের বাচ্চা হবে না? তাহলে একটি শুক্রাণু ও একটি ডিম্বাণুর মিলনে কি একটি বাচ্চা হয় না? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ, একটি শুক্রাণু ও একটি ডিম্বাণুর মিলনেই একটি শিশুর জন্ম হয়ে থাকে। তিনি একটি ছবি অঙ্কনের মাধ্যমে ব্যাপারটি স্পষ্ট রূপে বুঝিয়ে দিলেন যে, স্বামী স্ত্রীর মিলনের পর পুরুষের বীর্যের নির্ধারিত সংখ্যার শুক্রাণুর মধ্য থেকে একটি শুক্রাণু একটি ডিম্বাণুর ভিতরে প্রবেশ করার সাথে সাথে তা এমন শক্তভাবে জমাট বেধে যায় যে, আর কোন শুক্রাণু তাতে প্রবেশ করতে পারে না।

এমনকি এই ডিম্বাণুটি রেহেমে স্থান নেয়ার পূর্বে প্রায় ৪/৫দিন জরায়ুতো ঘুরতে থাকে। আর এদিকে অন্যান্য শুক্রকীটগুলো নিজেদেরকে উৎর্সগ করার মাধ্যমে উক্ত ডিম্বাণুকে বাঁচিয়ে রাখে।

উক্ত ডিম্বাণুটি ৪/৫দিন বেঁচে থাকতে কম পক্ষে বিশ কোটি শুক্রাণুর প্রয়োজন হয়, আল্লাহু আকবার! এর পর রক্ত থেকে পরিচর্যা গ্রহণ করতে থাকে। অতএব যে পুরুষের বীর্যে বিশ কোটির কম পরিমাণ শুক্রাণু থাকে সেই পুরুষে কোন বাচ্চা হয় না। ভ্রুনের জন্য এরূপ নিখুঁত ব্যবস্থাপনার অপরিহার্য প্রয়োজনের কথা একমাত্র বিচক্ষণ বুদ্ধিমান সৃষ্টিকর্তা ছাড়া আর কে বুঝতে পারে?

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেনঃ

نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ . أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ . أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ .

الواقعة :٥٧-٥٩

‘আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি। তারপরও কেন তোমরা তা সত্য বলে বিশ্বাস কর না? তোমরা কি তোমাদের বীর্যপাত সম্পর্কে ভেবে দেখেছ? তোমরা কি তা সৃষ্টি কর, না আমি সৃষ্টি করি?[2] উপরোক্ত আয়াতে মানব সৃষ্টি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছে।

---

[1] সূরা ফাতহ,২৩।

[2] সূরা ওয়াক্বিয়া ৫৮-৫৯।

কারণ গাফেল মানুষ প্রত্যহ দেখে যে, পুরুষ ও নারীর যৌন মিলনের ফলে গর্ভসঞ্চার হয়। এরপর তা জননীর গর্ভাশয়ে আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং নয় মাস পর পরিপূর্ণ মানব রূপে ভূমিষ্ট হয়। এই দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার কারণে বাহ্যদর্শী মানুষের দৃষ্টি এতেই নিবদ্ধ থেকে যায় যে, পুরুষ ও নারীর পারস্পরিক মিলনই মানব সৃষ্টির প্রকৃ কারণ। তাই আল্লাহ বলছেনঃ হে মানুষ! একটু ভেবে দেখ, সন্তান জন্ম লাভ করার মধ্যে তোমার হাত এতটুকুই যে, তুমি এক ফোঁটা বীর্য বিশেষ স্থানে পৌঁছে দিয়েছ। এরপর তোমার জানা আছে কি যে, বীর্যের উপর স্তরে স্তরে কি কি পরিবর্তন আসে? কিভাবে এতে অস্থি ও রক্ত মাংস সৃষ্টি হয়? এই ক্ষুদ্র জগতের অস্তিত্বের মধ্যে খাদ্য আহরণ করা, রক্ত তৈরী করা ও জীবাত্মা সৃষ্টি করা, কেমন যন্ত্রপাতি কিভাবে স্থাপন করা হয় এবং শ্রবণ, দর্শন, কথন, আস্বাদন ও অনুধাবন শক্তি নিহিত করা হয়, যার ফলে একটি মানুষের অস্তিত্ব একটি চলমান কারখানায় পরিণত হয়? পিতাও কোন খবর রাখে না এবং যে জননীর উদরে এসব হচ্ছে সেও কিছু জানে না। জ্ঞান- বুদ্ধি বলে কোন বস্তু দুনিয়ায় থেকে থাকলে সে কেন বোঝে না যে, কোন স্রষ্টা ব্যতীত মানুষের অত্যাশ্চর্য ও অভাবনীয় স্বত্বা আপনা আপনি তৈরী হয়নি।[1] সেই মহান স্রষ্টা আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ . ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ . ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ . ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ . المؤمنون : ١٢–١٥

'আমি মানুষকে মাটির সারাংশ থেকে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর আমি তাকে শুক্রবিন্দু রূপে এক সংরক্ষিত আধারে স্থাপন করেছি। এরপর আমি শুক্রবিন্দুকে জমাট রক্তরূপে সৃষ্টি করেছি। তারপর জমাট রক্তকে মাংসপিন্ডে পরিণত করেছি। এরপর সেই মাংসপিন্ড থেকে অস্থি সৃষ্টি করেছি। অতঃপর অস্থিকে মাংস দ্বারা আবৃত করেছি। অবশেষে তাকে এক নতুন রূপে দাঁড় করিয়েছি। নিপুণতম সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ কত কল্যাণময়।[2]

আমরা কি কখনও ভেবে দেখেছি যে, মানব শুক্রাণু যা তরল পদার্থের অতি সামান্য অংশ কিভাবে মায়ের রক্তের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ মানুষে পরিণত হলো? সেই তরল পদার্থের অতি সামান্য অংশ দ্বারা একটি হাত তৈরী হলো, অপর অংশ দ্বারা অনুরূপ আর একটি হাত হলো। এমনি ভাবে দু'টি পা, দু'টি চোখ, দু'টি কান, হৃদপিন্ড,

[1] তাফসিরে মাআরিফুল কুরআন, পৃষ্ঠা১৩২৮।

[2] সূরা মুমিনূন ১২-১৪।

ফুসফুস, মগজ, পাকস্থলি, কলিজা, মাংসপেশী,চামড়া ইত্যাদি তৈরী হলো। কে তিনি যার তত্ত্বাবধানে এতো ক্ষুদ্রাণু থেকে সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে নিখুত ও নৈপুন্যের সাথে মানুষের অঙ্গ - প্রত্যঙ্গগুলো এক নিরাপদ আধারে সৃষ্টি করলেন? কোন সন্দেহ নেই যে, তিনিই সেই মহান স্রষ্টা, সূক্ষ্ম জ্ঞানী ও সম্যক জ্ঞাত তিনি এক, অদ্বিতীয়। ডেভিড কি সুন্দর করে বলেছেনঃ You kept me sceened off in the belly of my mother (psalm 139,13). আমার মায়ের গর্ভে তুমিই আমাকে পর্দার অন্তরালে সুরক্ষিত করে রেখেছ হে স্রষ্টা।

মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ . الزمر: ٦

‘তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের মাতৃগর্ভে পর্যায়ক্রমে একের পর এক তিনটি অন্ধকারে। তিনি তোমাদের পালনকর্তা, সার্বভৌমত্ব তাঁরই। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। অতএব তোমরা কোথায় মুখ ফিরিয়ে চলেছ?[1]

উপরোল্লিখিত আয়াতে ১৪০০ শত বছর পূর্বে মানব সৃষ্টির রহস্য বর্ণিত হয়েছে যে, মানুষ তার মায়ের পেটে একের পর এক তিনটি অন্ধাকারে পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি হয়েছে। অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি আবিস্কারের পর মানুষ ১৮৫৩ সালের পর মানব জন্মের এ রহস্য জানতে পেরেছে।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেনঃ

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ . السجدة : ٥٣

‘অনতিবিলম্বে আমি পৃথিবীর দিগন্তে এবং তাদের নিজেদের মধ্যে আমার নিদর্শনাবলী দেখিয়ে দিব যাতে তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয় যে, ইহা সত্য’[2]

আব্দুল মাজীদ আঝ-ঝান্দানী তাঁর পুস্তকে উল্লেখ করেছেন, মাতৃগর্ভে যে পর্দা সন্তানকে ঘিরে রেখেছে তা খালি চোখে দেখতে একটি মনে হয়। আসলে একটি পর্দা নয়, বরং সেখানে রয়েছে তিন তিনটি পর্দাঃ

১. Endometrium (অন্তঃ আবরণ)
২. Myometrium (মধ্য আবরণ)
৩. Perimetrium (বহিরাবরণ)

[1] সূরা যুমার , ০৬।
[2] সূরা সিজদা, ৫৩।

এই তিনটি পর্দার প্রত্যেকটিই সেখানে কোন আলো প্রবেশ করতে দেয় না, সেখানে কোন পানি প্রবেশ করতে দেয় না। ঢুকতে দেয়না কোন উত্তাপ। এগুলো কি অন্ধকারের বৈশিষ্ট্য নয়? আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ . مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ . مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ . ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ .

عبس : ١٧-٢٠

'মানুষ ধ্বংস হোক! সে কত অকৃতজ্ঞ। তিনি তাকে কি বস্তু থেকে সৃষ্টি করেছেন? তিনি তাকে শুক্র থেকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তাকে সুপরিমিত করেছেন। অতঃপর তার পথ সহজ করেছেন।[1]

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষকে মাতৃগর্ভের তিন পর্দা বিশিষ্টি অন্ধকার প্রকোষ্টে এবংসংরক্ষিত জায়গায় বীর্য থেকে কত সুন্দর ভাবে তার গঠন-প্রকৃতি, আকার-আকৃতি, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দৈর্ঘ- প্রস্থ, চক্ষু, নাক, কান, ইত্যাদি এমন সুপরিমিত ভাবে সৃষ্টি করেছেন। এরপর আল্লাহ তাআলার অপার শক্তিই এই জীবিত ও পূর্ণাঙ্গ মানুষের মাতৃগর্ভ থেকে বাইরে আসার পথ সহজ করে দেন।

আধুনিক বিজ্ঞান বর্ণনা করছে যে, সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার পূর্বে মাতৃগর্ভ থেকে যে পানি বেরিয়ে আসে সেই পানির বেশ কয়েকটি বৈশিষ্ট্য রয়েছেঃ (এক) এই পানি সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ ও রোগ জীবাণুমুক্ত (দুই) এই পানির মধ্যে মাতৃগর্ভে বাচ্চা স্বাভাবিক আঘাত থেকে সুরক্ষিত থাকে। (তিন) এই নব মেহমান যে পথ দিয়ে পৃথিবীতে আগমন করবে সেই পথে যদি এই মেহমানের কোন শত্রু থেকে থাকে তাহলে এই পানি সেই সমস্ত রোগ জীবাণুকে ধ্বংস করে এই পথকে শত্রুমুক্ত ও নিরাপদ রাখে। (চার) এই পানি সেই পথ পিচ্ছিল রাখে (পাঁচ) এই পানি সেই পথকে প্রশস্থ হওয়ার সহায়তা করে।

এগুলো যখনই গভীর ভাবে সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে চিন্তা করা হয় তখনই আমার মাথা মহান সৃষ্টিকর্তার জন্যই মনের অজ্ঞাতে এমনিই নুয়ে আসে। বস্তুতঃ এরূপ নিখুঁত সুন্দর বিস্ময়কর ও উদ্দেশ্য মূলক পদ্ধতি প্রক্রিয়া ক্রমবিকাশের অধীন হতে পারে না। এ থেকেই উচ্চতর বিচক্ষণ সম্পন্ন এই মহান সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব অকাট্য ও অনস্বীকার্য হয়ে উঠে।

আল্লাহ সুহানাহু ওয়া তাআলা বলেনঃ

ذَلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ . المؤمن : ٦٢

[1] সূরা আবাসা, ১৭-২০।

'তিনিই মহান আল্লাহ, তোমাদের পালনকর্তা, সবকিছুর স্রষ্টা। তিনি ব্যতীত আর কোন উপাস্য নেই। অতএব তোমরা কিভাবে বিপথগামী হচ্ছ?[1]
তিনি আরো বলেনঃ

مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا . نوح : ١٣

'তোমাদের কি হলো যে, তোমরা আল্লাহর মাহাত্ম্যাক স্বীকার করছ না? '[2]

أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ . الطور : ٣٥

'তারা কি স্রষ্টা ব্যতীতই সৃষ্টি হয়েছে অথবা নিজেরাই কি তারা নিজেদেরকে সৃষ্টি করেছে?[3]
শরীর বিদ্যা (ANATOMY) থেকে জানা যায়, পুরুষের বীর্য তৈরীর স্থান 'অন্ড কোষদ্বয়' এবং নারীর ডিম্বের আধাঁর 'ওভারী'[4]
এই কোটি কোটি শুক্রাণুদেরকে যদি অন্ডকোষ থেকে বের হওয়ার পূর্বে জানিয়ে দেয়া হতো যে, তোমরা এমন এক স্থানে স্থানান্তরিত হচ্ছো যে স্থান এর চেয়ে অনেক গুণ বড় আর সেখানে মাত্র একজন বাস করবে। শুক্রাণুগুলো কখনই তা বিশ্বাস করতোনা । ছোট্র স্থানে কোটি কোটি, আর এর চেয়ে অনেক গুণ বড় সেখানে মাত্র একজন?
অপর দিকে মাতৃগর্ভে সন্তান দীর্ঘ নয়টি মান অবস্থান করে। সে যেন সেখানে একটি রাজ্যে একাই রাজা। তার নেই কোন অংশীদার। অটোমেটিক রিযকের ব্যবস্থা রয়েছে। খাবার চিন্তা নেই, কোনো ভয় নেই, শত্রুর আক্রমন নেই, গরমের ক্লান্তি নেই, শীতের কষ্ট নেই। তার রাজত্ব পুরাটাই যেন এয়ার কন্ডিশনড। এমতাবস্থায় তাকে যদি বলা হয় যে, তুমি এখানে এক সংকীর্ণ স্থানে বসবাস করছ, অনতি বিলম্বে তুমি এমন প্রশস্ত স্থানে অর্থাৎ পৃথিবীতে গমন করবে যেখানে রয়েছে আলো, বাতাস, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, নদ- নদী, পাহাড়-পর্বত ইত্যাদি সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে তোমার খেদমতের জন্য রয়েছে। সেখানে আরও থাকবে তোমার সহপাঠি, বন্ধু- বান্ধব, আত্মীয়, স্বজনসহ আরও অনেকে। তারপরও তোমার জন্য সেখানে থাকবে আরাম আয়েশ আনন্দ উল্লাস ও সুখ শান্তির হাজার ব্যবস্থা। এরপরও সে এটাকে বিশ্বাস করতে পারে না। আর বিশ্বাস করতে পারে না বলেই সেখান থেকে আসতে সে

[1] সূরা মুমিন, ৬২।
[2] নূহ ১৩।
[3] সূরা ত্বোর , ৩৫।
[4] কুরআনে বিজ্ঞান ৫৭।

অস্বীকৃতি জানায়। কথিত আছে, ফেরেস্তাগণ তাকে ঘাঁড় ধরে ধাক্কা দিয়ে বের করে দেয়। তাই নাকি সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার সময় মাথাটি আগে বের হয়। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

وَاللهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. النحل : ٧٨

'আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের মায়ের গর্ভ থেকে বের করেছেন। তোমরা কিছুই জানতে না। তিনি তোমাদের কর্ণ,চক্ষু, ও অন্তর দিয়েছেন যাতে তোমরা অনুগ্রহ স্বীকার কর।[1]

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আরও বর্ণনা করেনঃ

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ . البقرة : ٢٨

' (হে মানব সকল!) তোমরা কি করে আল্লাহকে অস্বীকার করছ, অথচ তোমরা ছিলে মৃত, অতঃপর তিনি তোমাদেরকে জীবন দান করেছেন, আবার তিনি তোমাদেরকে মৃত্যু ঘটাবেন। তারপর তিনি তোমাদেরকে পুনরায় জীবিত করবেন এবং অবশেষে তোমাদেরকে তাঁরই নিকট ফিরে যেতে হবে।[2]

বর্তমান আধুনিকতার যুগে জ্ঞান বিজ্ঞান উন্নতির ফলে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতির আবিস্কারের মাধ্যমে মানুষ জানতে সক্ষম হচ্ছে যে, তারা কিছুই ছিল না, তারা মৃত ছিল। তারা প্রত্যক্ষ করছে যে নারী পুরুষের মাধ্যমে তাদের আগমন ঘটেছে, তারা জীবিত হয়েছে সত্য। তারপর, তাদের চোখের সামনে একের পর এক সবাই বিদায় নিয়ে যাচ্ছে, তারা মৃত্যু বরণ করছে। তাতেও কারও সন্দেহ নেই। তাদের এখন সন্দেহ রয়েছে পুনরুত্থানের ব্যাপারে। আল্লাহ তাআলা বর্ণনা করেনঃ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا. سورة الحج:٥

---

[1] সূরা নাহল ৭৮।

[2] সূরা বাক্বারা ২৮।

'হে মানুষেরা! যদি তোমরা পুনরুত্থানের ব্যাপারে সন্দিহান হও তাহলে (ভেবে দেখ) আমি তোমাদেরকে মৃত্তিকা থেকে সৃষ্টি করেছি। এরপর বীর্য থেকে, এরপর জমাট বাঁধা রক্ত থেকে, এরপর পূর্ণাকৃতি বিশিষ্ট ও অপূর্ণাকৃতি বিশিষ্ট মাংস পিন্ড থেকে, তোমাদের কাছে ব্যক্ত করার জন্যে। আর আমি যা ইচ্ছা করি তা এক নিদির্ষ্ট কালের জন্য মাতৃগর্ভে স্থির রেখে দিই। এরপর আমি তিমাদেরকে শিশু অবস্থায় বের করি, তারপর তোমরা যৌবনে পদার্পন কর। তোমাদের মধ্যে কারও মৃত্যু ঘটানো হয় এবং তোমাদের মধ্যে কাউকে নিস্কর্মা বয়সপর্যন্ত পৌঁছানো হয় যার ফলে সে যা কিছু জানত সে সম্বন্ধে সে আর জ্ঞাত থাকে না।[1]

এমনি ভাবে পবিত্র কুরআনে যখনই মানব সৃষ্টির বর্ণনা উল্লেখ হয়েছে তার অধিকাংশ স্থানে আগে ও পরে আয়াতে কেয়ামাতের বিশ্বাসের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে।

ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ . ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ . المؤمنون : ١٥-١٦

'এরপর তোমরা মৃত্যু বরণ করবে, অতঃপর কেয়ামাতের দিন তোমরা পুনরুত্থিত হবে।'[2]

এক এক করে কুরআনে বর্ণিত সব কিছুই যেহেতু সত্যে প্রমাণিত হচ্ছে, অতএব কেয়ামাতের পুনরুত্থানের ব্যাপারে কোনই সন্দেহ নেই। আর জান্নাতের যে সব নিয়ামতের কথা বর্ণিত হয়েছে তাতে ও মানুষের মনে কোন ধরনের সন্দেহ থাকার কথা নয়।

গর্ভের সন্তানের বর্ণনা ইলমুল গায়েব নয়

বর্তমান যুগ আধুনিক যুগ। এ যুগে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি আবিস্কারের মাধ্যমে বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রয়েছে। কম্পিউটার ও আধুনিক এক্সরে মেশিনের মাধ্যমে যখন গর্ভের অবস্থা সম্পর্কে খবর দিচ্ছে তখন মানুষ ভাবতে শুরু করেছে যে, বিজ্ঞানের উন্নতি ও অগ্রগতির মাধ্যমে বিজ্ঞানীগণ হয়তো অদৃশ্যের জ্ঞান (ইলমুল গায়েব) জানতে শুরু করেছে। আল্লাহ তাআলা এ ব্যাপারে বলেনঃ

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ . النمل : ٦٥

'বলুন! আল্লাহ ব্যতীত নভোঃমন্ডল ও ভূমন্ডলে কেউ গায়েবের খবর জানে না এবং তারা জানে না যে, কখন তারা পুনরুজ্জীবিত হবে।[1]

---

[1] সূরা হজ্জ, ৫।

[2] সূরা মুমিনূন , ১৫-১৬।

এ বিষয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

مفاتيح الغيب خمسةٌ لا يعلمها إلا الله، لا يعلم أحد ما يكون في غدٍ إلا الله، ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام إلا الله، و لا يعلم أحدٌ متى يأتي المطر إلا الله، وما تدري نفس ماذا تكسب غداً، وما تدري نفس بأي أرضٍ تموتُ . رواه أحمد ٢/ ٢٤-٥٢.

'ইলমুল গায়েব এর বিষয় হচ্ছে পাঁচটি যা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না । আগামী কাল কি হবে তা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না । আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেনা গর্ভে কি আছে। আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেনা যে, কখন বৃষ্টি আসবে। কোন ব্যক্তি জানে না যে, আগামীকাল সে কি অর্জন করবে। কোন ব্যক্তি জানেনা যে কোন স্থানে সে মৃত্যু বরণ করবে। মুসনাদে আহমাদ (২/২৪-৫২)

উপরোক্ত হাদীসের পাঁচটি বিষয়ের মধ্যে তিনটি বিষয়ে কারও কোন সংশয় অথবা দ্বিমত নেই। এমন কেউ দাবী করে না যে,আমি জানি আগামীকাল আমার জন্য কি হবে; আমি আগামীকাল কি অর্জন করব তা আমি জানি; অথবা কেউ এমন বলতে পারে না, আমি অমুক স্থানে মারা যাব। কেয়ামত কখন সংঘঠিত হবে তাও কেউ বলতে পারে না। এগুলোর ব্যাপারে কারও কোন দ্বিধা দ্বন্দ্ব নেই। বর্তমান যুগে দ্বন্দ্ব হতে দেখা যায় দু'টি ব্যাপারে। তা হচ্ছে (১) গর্ভ যা ধারণ করে এবং (২) কখন বৃষ্টি হবে?

বর্তমান চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতিতে চমকে উঠা মানুষেরা ভাবতে শুরু করেছে এই তো মানুষ 'ইলমুল গায়েব' জানতে শুরু করেছে। তারা এখন বলতে সক্ষম হচ্ছে যে, গর্ভে কি রয়েছে- ছেলে না মেয়ে। তারা আরও বলতে সক্ষম হচ্ছে, সেই শিশুটি কোন অবস্থায় আছে ইত্যাদি। অথচ মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'এটি ইলমুল গায়েব' আল্লাহ ছাড়া কেউ তা জানে না? হ্যাঁ, আমরা বিশ্বাস করি যেহেতু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন। আর তিনি নিজের থেকে কোন কথা বলেন না, যতক্ষণ না সেই ব্যাপারে তাঁর কাছে অহী এসেছে।

এ বিষয়ে স্পষ্ট হতে হলে আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে এ সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বর্ণিত অন্যান্য বাণীর দিকে। তিনি অন্য হাদীসে বলেছেনঃ

ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله.

'গর্ভাশয়ে যা সংকুচিত হয় তা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেনা।' (আহমাদ)

---

[1] সূরা নামল ৬৫।

এখানে تغيض الأرحام শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। আমাদেরকে প্রথমে জানতে হবে " তাগীদু" শব্দের অর্থ কি? তার অর্থ হচ্ছে সঙ্কুচিত হওয়া, কমে যাওয়া,হ্রাস পাওয়া ও শুষ্ক হওয়া। এ সম্পর্কে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেনঃ

اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ. سورة الرعد:٨

'আল্লাহ জানেন প্রত্যেক নারী যা গর্ভধারণ করে এবং তিনি জানেন গর্ভাশয়ে যা সঙ্কুচিত ও বর্ধিত হয়। এবং তাঁর কাছে প্রত্যেক বস্তুরই একটা পরিমাণ রয়েছে।' [1]

وما تغيض الأرحام وما تزداد.

'গর্ভাশয়ে যা সঙ্কুচিত হয় এবং বর্ধিত হয়' গর্ভাশয় বর্ধিত হয় এটি সবাই জানে যে, সেখানে শিশু বড় হতে থাকে বলেই পেট বড় হতে থাকে। আর " তাগীদু" শব্দটি আরবী ভাষায় দু'টি অর্থে ব্যবহৃত হয়। (এক) সঙ্কুচিত হওয়া, কমে যাওয়া, শুষ্ক হওয়া হ্রাস পাওয়া। (দুই) খনন করা, ডুবে যাওয়া। যেমন তুফানের পানি সর্ম্পকে আল্লাহ তাআলা বলেনঃ।

وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ . سورة هود: ٤٤

'আর নির্দেশ দেয়া হলঃ হে পৃথিবী! তোমার পানি চুষে নাও, আর হে আকাশ! থেমে যাও। তখন পানি কমে গেল।[2] বর্তমান স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীগণ বর্ণনা করছেন যে, পুরুষের বীর্য গর্ভাশয়ে প্রবেশ করার পর ঘুরতে থাকে ও কমতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত একটি মাত্র জীবানু অবশিষ্ট থাকে যা একটি শুক্রাণু ও একটি ডিম্বাণুর মিলনে সংঘটিত হয়েছিল। স্বাস্থ্য বিজ্ঞান আমাদেরকে আরও জানাতে সাহায্য করে যে স্বামী স্ত্রীর একবার মিলনে পুরুষের থেকে যে বীর্য বের হয় তাতে শুক্রাণুর সংখ্যা কম পক্ষে বাইশ কোটি হয়ে থাকে। শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর মিলন ঘটার পর ৭২ ঘন্টা তার নিরাপদ স্থান অনুসন্ধান করতে থাকে। এই ৭২ ঘন্টায় অন্যান্য শুক্রাণুগুলি নিজেদেরকে উৎসর্গ করে ওকে বাঁচিয়ে রাখে। এই সময় সে রেহেমের প্রাচীর খনন করে তার স্থান করে নেয়। খনন ও সংকোচনের মধ্য দিয়েই গর্ভে সন্তান জন্মের সূচনা হয়। আর সেখানেই এ সন্তানের ভবিষ্যত নির্ধারণ করা হয়। সে বাবার মত হবে, নাকি মায়ের মত হবে, তার রং কি হবে, তার নাক কেমন হবে, তার কান কেমন হবে, তার চেহারা কেমন হবে, সে কত দিন গর্ভে থাকবে, কতদিন দুনিয়াতে জীবিত থাকবে,

[1] সূরা রা'দ ০৮।

[2] সূরা হুদ, ৪৪।

কি পরিমান রিযক পাবে, সৌভাগ্যবান হবে নাকি দুর্ভাগা হবে ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করা হয়। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ . مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ . مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ . سورة عبس : ١٧- ١٩

'মানুষ ধ্বংস হোক! সে কত অকৃতজ্ঞ, তিনি তাকে কি বস্তু থেকে সৃষ্টি করেছেন? শুক্রাণু থেকে তাকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তার তাকদীর নির্ধারণ করেছেন।'[3] এ সব কিছুর নিশ্চিত ও নির্ভুল জ্ঞান যদি কোন ব্যক্তি জানতে সক্ষম হতো তাহলেই হয়তো দাবী করতে পারতো যে ইলমুল গায়েব জানে। কিন্তু এর পূর্ণও নির্ভুল জ্ঞান একমাত্র আল্লাহরই রয়েছে। অন্য কারো নেই।

মানুষ যুগ যুগ ধরে চেষ্টা করেছে, গবেষণা করেছে যে, কি ভাবে গর্ভাশয়ে সংকোচন হয়, কিভাবে রেহেমের প্রাচীর খনন কাজ সম্পন্ন হয় এবং এর ভবিষ্যৎ কি? শাইখ আব্দুল মাজীদ ঝান্দানী বর্ণনা করেছেন যে, আমেরিকার প্রফেসর মার্শাল জনসন দীর্ঘ ১০ বছর এ বিষয় নিয়ে গবেষণা করেছেন। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো যে, এই গবেষণার ফলাফল কি? তিনি বললেনঃ শেষে আমি কেঁদেছি। কেননা আমি আমার এ দীর্ঘ ১০ বছর বৃথা নষ্ট করেছি। আমি কিছুই জানতে পারিনি। তাকে বলা হলো যে, আপনি যদি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী শ্রবণ করতেন তাহলে আপনার এই ১০ টি বছর নষ্ট হতোনা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

مفا تيح الغيب خمسة لا يعلمها إلا الله، . . . لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله. مسند أحمد ٢/ ٢٤-٥٢

'গায়েবের চাবি হচ্ছে পাঁচটি যা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। . . . . . গর্ভাশয়ে কি সংকুচিত হয় তার নিশ্চিত ও নির্ভূল জ্ঞান আল্লাহ ছাড়া কেউ রাখে না।'[1]

গর্ভাশয়ে শিশু বৃদ্ধি পাওয়ার পর আধুনিক কম্পিউটার অথবা এক্সরে মেশিনের মাধ্যমে বর্ণনা করার নাম ইলমুল গাইব নয়। এ সর্ম্পকে আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেনঃ

إنَّ مِفتاح الغيب(الغيض) وليس الإزدياد

---

[3] সূরা আবাসা, ১৭-১৯।

[1] মুসনাদে আহমাদ ২/২৪-৫২।

'নিশ্চয়ই গায়েবের চাবি হচ্ছে সংকোচনের জ্ঞান, বৃদ্ধির জ্ঞান নয় [2]

সন্তানটি বৃদ্ধি পাওয়ার পর ফেরেস্তাগণও জানতে পারে, তার রিযক, তার বয়স, ছেলে না মেয়ে, সৌভাগ্যবান না দুর্ভাগা। অতএব, কিছু বৈশিষ্ট্য জানার নাম ইলমুল গায়েব নয়।

আল্লাহ আমাদের সঠিক জ্ঞান দান করুন।

স্নায়ুতন্ত্র ও আল্লাহর একত্ববাদ

মানুষকে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আশরাফুল মাখলুকাত বা সেরা সৃষ্টি রূপে সৃজন করেছেন। মানব জাতির জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা করেছেন। মানুষ যদি নিজের দেহ যন্ত্রের কলাকৌশলের প্রতি গভীর ভাবে নজর করে তাহলে সেই মহান সৃষ্টিকর্তার একত্ববাদের সাক্ষ্য দেখতে পাবে।

আসুন তা হলে নজর দেয়া যাক স্নায়ুতন্ত্রের প্রতি। স্নায়ুতন্ত্র মানব জাতির জন্য আল্লাহর নেয়ামতের মধ্যে একটি বড় মূল্যবান নেয়ামত যার দ্বারা মানুষ চিন্তা গবেষণা করে দেখে ও শ্রবণ করে এবং তার শরীরের প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের উপর শাসন করে এবং সেগুলো পরিচালনা করে। এই অনুভূতি যন্ত্রটি সেই মহান সৃষ্টিকর্তা একটি নিরাপদ প্রকোষ্ঠে সুরক্ষিত করেছেন। যেহেতু মস্তিস্ক অত্যন্ত স্পর্শকাতর, কিন্তু সবচেয়ে দামী। এটির ওজন মাত্র তিন পাউন্ড। এর রয়েছে ১৩০০ কোটি কন্ট্রোল বাটন। এর প্রতিটি বাটনের একটা না একটা দায়িত্ব বয়েছে, সেই নিয়ন্ত্রণ কক্ষ থেকে গোটা দেহের কোটি কোটি সেনা ও প্রহরীকে নিয়ন্ত্রণ করে।

পৃথিবীর সর্ব শ্রেষ্ঠ আবিস্কার কম্পিউটারের চেয়ে হাজার কোটি গুণ জটিল এই ছোট্ট মেশিনটি। এর প্রতিটি কর্ম তৎপর কোষের নাম হচ্ছে নিউরণ। এগুলো শরীরের বিভিন্ন অংশের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে, যাকে বলা হয়া যোগাযোগ মন্ত্রণালয়। মূল নিয়ন্ত্রকের আদেশ পাওয়ার সাথে সাথে হাজার কোটি কোষে ছড়িয়ে দেয়। মানুষের কল্পনা, ইচ্ছা ও অনুভূতিকে নিয়মতান্ত্রিক ভাবে বাস্তবায়ন করে।

মানুষের আবিস্কৃত অত্যাধুনিক কম্পিউটারের কী বোর্ডের বোতাম টিপার মাধ্যমে মেমরী থেকে তথ্য সংগ্রহ করে তারপর পর্দায় উপস্থাপন করে। আর আল্লাহ প্রতিটি মানুষের মধ্যে যে কম্পিউটার স্থাপন করে রেখেছেন তার কোন বোতাম টিপতে হয় না, বরং ইচ্ছা, কল্পনা ও ধারণার সাথে সাথেই তার কার্যকারিতা শুরু হয়। যেমন আপনাকে কেউ বললো যে, আপনি সূরা নাস পড়ুন। আপনি শোনার সাথে সাথে বিলম্ব ছাড়াই উক্ত সূরা পড়তে শুরু করেছেন, কিভাবে তা সম্ভব হলো?

---

[2] বুখারী,

আধুনিক বিজ্ঞান বলছে, কানে আওয়াজটি শোনার সাথে সাথে মস্তিষ্কে খবরটি টেলিগ্রাফের ন্যায় পৌঁছে দিয়েছে এবং সেই মুহুর্তেই মগজের সেই সব কন্ট্রোল রুম থেকে নিয়ন্ত্রিত হয়ে আপনার মুখ নামক অঙ্গের মাধ্যমে প্রকাশিত হচ্ছে।

উদাহরণ স্বরূপ আরও বলতে পারি, যদি আমার পিঠে একটা মশা বসে আমার রক্ত চুরি করছে। অথচ আমি তা দেখতে পারছিনা। আর সেই মুহুর্তেই সেই মস্তিষ্কের কন্ট্রোল রুমগুলো থেকে হাতের কাছে ফ্যাক্স করায় সংবাদ পৌঁছার মাধ্যমে তার এ্যাকশন শুরু হয়। তাই প্রয়োজনীয় সার্বিক ব্যবস্থা অবলম্বন করি। কিন্তু ঘুমন্ত অবস্থায় যদি হাতের উপর মশায় কামড়ায় বা পায়ের তালুতে সুড়সুড়ি দেয়া হয় তখন দেখা যাবে, আমরা অজ্ঞাত অবস্থায় হাতটি বা পা' টি সরিয়ে নিচ্ছি।

এটি একটি প্রতিবর্তী ক্রিয়া বা Reflexation. কয়েক মিলি সেকেন্ডের মধ্যেই ক্রিয়াটি পুরোপুরি সম্পাদিত হয়। তা ভাবনার অতীত দ্রুততায় সংঘটিত হয়।

প্রতিবর্তী চাপ কিভাবে কাজ করে তার একটি উদাহরণ পেশ করেছেন এ.জে.এম.শহিদুল্লাহ এবং এ. এন. চৌধুরী।[1] 'মনে কর, তোমার পায়ে একটা কাঁটা হঠাৎ বিঁধে গেল। তুমি তৎক্ষণাৎ পা'টিকে মাটি থেকে সরিয়ে নিলে। এখানে কিভাবে স্নায়ুস্পন্দন প্রতিবর্ত চাপের মাধ্যমে বাহিত হয় লক্ষ্য কর। পায়ের পাতার চামড়ায় অসংখ্য রিসেপ্টর থাকে। এ রিসেপ্টর গুলো কাটা বিঁধার ফলে "ব্যথা" নামক যে উদ্দীপণা সৃষ্টি হয় তা গ্রহণ করে অর্ন্তবাহী শাখা দিয়ে সুষুম্না কান্ডের মধ্যে প্ররেণ করে। সুষুম্না কান্ড তখন বহির্বাহী শাখা দিয়ে পায়ের ইফেক্টরে অর্থাৎ সংকোচিত হয়, ফলে পদতল আপনা থেকেই কাটা বিঁধা স্থান থেকে সরে আসে।"

এ ব্যাপারে মনির উদ্দিন আহমাদ আরও লিখেছেনঃ 'আমাদের পিছনে যে মেরুদন্ড রয়েছে তার মাধ্যমে তা সারা শরীরের যন্ত্রপাতিগুলোকে সজিব ও তৎপর রাখে। এর আবার স্বতন্ত্র কয়েকটি বিভাগ রয়েছে। এক এক বিভাগের ওপর এক এক ধরনের দায়িত্ব দিয়ে রাখা হয়েছে। যেমন কোন অংশকে বলা হয়েছে শোনার জন্য, কোন অংশকে বলা হয়েছে দেখার জন্য, আবার কোন অংশকে বলা হয়েছে অনুভূতিগুলোকে কেন্দ্রীয় কন্ট্রোল টাওয়ারে ট্রান্সমিট করে দেয়ার জন্য। সর্বশেষে এতে আবার বসানো হয়েছে একটি স্বয়ংক্রিয় শক্তিশালী মেমোরী সেল, যার কাজ হলো নিত্য নতুন সংগ্রহ গুলোকে যথাযথ ভাবে সংরক্ষণ করা এবং প্রয়োজনের সময় রিউইন্ড করে মেমোরীগুলোকে সামনে নিয়ে আসা। এই স্মৃতি সংরক্ষণশালা প্রতি সেকেন্ডে ১০টি নতুন বস্তুকে স্থান করে দিতে পারে। আশ্চর্যজনক ব্যাপার হচ্ছে, পৃথিবীর সর্বকালের সর্ব প্রকার যাবতীয় তথ্য ও তত্ত্বকে যদি এক জায়গায় একত্র

---

[1] উচ্চ মাধ্যমিক জীববিজ্ঞান, প্রাণী বিজ্ঞান, ২৭৭।

করে এ মেমোরী সেলে রাখা যায় তাতে ও এর লক্ষ ভাগের এক ভাগ জায়গাও পূরণ হবে না ।[1]

মুহাম্মদ সিদ্দিক লিখেছেন, মানুষের একটি মগজে যে পরিমাণ জন্ম বা উৎপত্তি ঘটিত (genetic) তথ্য রয়েছে তা লিপিবদ্ধ করতে বড় বড় লাইব্রেরীর গ্রন্থসমূহ নিঃশেষ হয়ে যাবে । [2]

আমরা কি কখনও চিন্তা করেছি যে, কিভাবে মহান স্রষ্টা শুক্রাণুর একটি অংশ থেকে মায়ের উদরে আমাদের প্রত্যেকের জন্য এমন অলৌকিক ব্রেইন সৃষ্টি করেছেন। ডি, এন, এ (জীবের ক্ষুদ্রতম কোষ নির্যাস) এর ভিতর অসংখ্য তথ্যের সন্নিবেশ প্রমাণ করে যে, একজন অতিশয় বিচক্ষণতা সম্পন্ন স্রষ্টা প্রাকৃতিক নিয়ম বিধানের পূর্ণ মাত্রায় জ্ঞান ও উপলব্ধি নিয়ে এ সব দেহের পরিকল্পনা ও সৃষ্টিকার্য সম্পন্ন করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ . سورة آل عمران ٦ :

'তিনিই সেই আল্লাহ যিনি স্বীয় ইচ্ছানুসারে জরায়ুর মধ্যে তোমাদের আকৃতি গঠন করেন। সেই পরাক্রান্ত বিজ্ঞানময় ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই ।' [3]

চোখ ও আল্লাহর একত্ববাদ

আল্লাহর যে সমস্ত নেয়ামত মানব জাতির প্রতি বর্ষিত হচ্ছে তা অফুরন্ত ও অগণিত। তন্মধ্যে চোখ একটি বড় নেয়ামত। আল্লাহর হাবীব মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদীসে কুদসীতে বর্ণনা করেনঃ

إنَّ الله عزَّ وجلَّ قال: إذا ابتلَيْتُ عبديْ بحبيْبتين فصبر عوَّضتُه عنهما الجنة (رواه البخاري)

'আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেনঃ যখন আমি আমার বান্দাকে তার দুটি প্রিয় জিনিসের (চোখ) পরীক্ষা করি, অতঃপর সে যদি ধৈর্য ধারণ করে তাহলে আমি তার বিনিময়ে তাকে জান্নাত প্রদান করব।[2] কোন সন্দেহ নেই যে, মানুষের চোখ একটি

---

[1] মাসিক সংস্কার ৫/১৪।

[2] ষ্টিফেন হকিং নাস্তিকতা ও ইসলাম,পৃষ্ঠা ১৬৬।

[3] সূরা আলে ইমরান, ৬।

[2] বুখারী ।

বড় সম্পদ। চোখ দিয়ে আমরা বহিঃজগতের রূপ অনুভব করি। আমরা জন্মসূত্রে তা পেয়েছি বিধায় অনেকেই তার গুরুত্ব বুঝে না। সেই মহান সৃষ্টিকর্তা যদি তা সৃষ্টি না করতেন তাহলে আমরা কিছুই দেখতে পেতাম না। আমরা অন্ধ হয়ে থাকতাম। এ পৃথিবীতে যাদের চোখ নেই তারাই বুঝতে পারে যে, এ চোখের কি মূল্য।

এই সূক্ষ্ণ যন্ত্রের মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন ধরনের রং, ছবি ও আকৃতির পরিচয় লাভ করতে পারি। আমাদের চোখগুলো অতি ক্ষুদ্র, কিন্তু তার কার্যক্ষেত্র শত শত মিটার পর্যন্ত ব্যাপৃত ও প্রসারিত। এমন কি আকাশের গ্রহ নক্ষত্র পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম।

বিজ্ঞানের অগ্রগতির মাধ্যমে প্রকাশিত হচ্ছে যে, আমাদের চোখের মধ্যে এমন একটি দূরবীক্ষণ যন্ত্র রয়েছে যা দূরত্বের ভিত্তিতে দৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রণ করে। যেমন আমি এখন নিকটবর্তী কোন বস্তুর প্রতি দৃষ্টি দিচ্ছি ফলে তা স্পষ্ট ভাবে দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু একটু দূরে যে সমস্ত জিনিস রয়েছে তা কিন্তু আমি স্পষ্ট রূপে দেখতে পাচ্ছিনা। এমনি ভাবে আমি যদি দূরবর্তী জিনিসের প্রতি নজর দেই তাহলে সেগুলো স্পষ্ট দেখতে পাই, কিন্তু কাছের বস্তুটি তখন অস্পষ্ট হয়ে যায়। কেন এমন হয়?

আধুনিক বিজ্ঞানে প্রকাশ যে, সেখানে এমন একটি দর্শন নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র রয়েছে যা চোখের দূরত্বকে নিযন্ত্রণ করে। ফলে দূরে অথবা কাছে যেখানেই নজর করি না কেন তা স্পষ্ট ভাবে দেখতে পাই। মানুষ একই সময় দুই চক্ষুর সাহায্যে দেখে। দৃষ্টি ক্ষেত্রে অবস্থিত বস্তু ও চক্ষুর মাঝে দূরত্ব অপরিবর্তনীয় রেখে কেবল লেন্সের বক্রতার পরিবর্তন সাধন করে মানুষ রেটিনায় প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করে। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলোঃ রেটিনার কোষ সমূহ অপটিক স্নায়ুর মাধ্যমে সেই প্রতিবিম্বের অনুভূতি মস্তি স্কের দৃষ্টি কেন্দ্রে উল্টাভাবে পাঠিয়ে দেয়।

মস্তিস্কের নিয়ন্ত্রনে উল্টা প্রতিবিম্ব সোজা হয়ে যায়। ফলে মানুষ বস্তুটি সোজা দেখে। আমরা কি কখনও চিন্তা করেছি যে, কোন কুশলী আমাদের ব্রেইনে এই চিত্রকে পজিটিভ করে পেশ করেছেন?

গবেষকগণ আরও বর্ণনা করেন যে, চোখের ঝিল্লির দশম স্তর এমন একটি স্থান যে স্থানে বস্তুর প্রতিবিম্ব প্রতিপলিত হয়। সেই স্থানটি তিন কোটি স্নায়ুকোষ দিয়ে গঠিত। এগুলোর কাজ কি? এগুলো আলো সংগ্রহ করে। ফলে আমরা দেখতে পাই। রং গ্রহণের জন্য ৩০ লাখ গাজরের ন্যায় লেথ মেশিন দিয়ে কাজ করার ন্যায় সলা রয়েছে। কি অলৌকিক বস্তু! তুমি তোমার মায়ের গর্ভে তিনটি আবরণের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছ। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ . سورة الزمر: ٦

‘তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের মাতৃগর্ভে পর্যায়ক্রমে একের পর এক তিনটি অন্ধকারে। তিনিই আল্লাহ তোমাদের পালনর্কতা, সার্বভৌমত্ব তাঁরই। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। অতএব, তোমরা মুখ ফিরিয়ে কোথায় চলছো?[1]

সেখানে কোন আলোর ব্যবস্থা ছিল না, তুমি সেখানে আলো দেখতে পাওনি। সেখানে কোন রংয়ের ব্যবস্থাও ছিল না। তারপর তোমার এই অলৌকিক চোখ দু‘টি কেন সেখানে সৃষ্টি হলো?

তোমার মনে এমন কি কোন প্রশ্ন জাগে না যে, কে তিনি, যিনি তোমার মায়ের পেটে অন্ধকারে এমন সুন্দর মূল্যবান চোখ দু‘টি সৃষ্টি করেছেন?

কোন সন্দেহ নেই যে, যখনই তুমি তোমার মায়ের গর্ভে তোমার গঠন প্রণালী নিয়ে ভাবনা করবে তখনই তুমি সেই মহান করুণাময় সৃষ্টিকর্তার অসংখ্য নিদর্শন দেখতে পাবে। তুমি কি কখনও ভেবে দেখেছ যে, তোমার চোখ দু‘টিই তৈরী হয়েছে শুক্রাণুর একটি ক্ষুদ্রাংশ থেকে? কে তাকে এই শক্তি প্রদান করলেন যার ভিতরে দূরত্ব নিয়ন্ত্রণের জন্য অনুবীক্ষণ যন্ত্র, দর্শন কার্য পরিচালনার জন্য তিন কোটি স্নায়ুকোষ এবং রং পার্থক্য করার জন্য ৩০ লাখ সলা সৃষ্টি করলেন? কে তিনি যিনি চক্ষুর জন্য মাথার খাপের মধ্যে স্থান করে ব্রেনের সাথে সংযোগ করে চোখের পাতা বিভক্ত করে দিলেন?

নিশ্চয়ই এটা সেই স্রষ্টার অলৌকিকতা যিনি তোমার ভবিষৎ সম্পর্কে সার্বিক ভাবে অবহিত। তিনি ভালো ভাবে জানেন যে, তুমি এমন এক জগতে আগমন করবে যেখানে আলোর ব্যবস্থা রয়েছে, সেখানে গমন করার পর তোমার এই চোখের বিশেষ প্রয়োজন হবে। তাই তিনি তোমার অজান্তে এই সৃষ্টিকে সুন্দর, সঠিকভাবে, অত্যন্ত নিপুণতার সাথে তৈরী করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. النجم : ٣٢

‘তিনি তোমাদের সম্পর্কে ভাল করে জানেন, যখন তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মৃত্তিকা থেকে এবং যখন তোমরা মাতৃগর্ভে ভ্রুন রূপে অবস্থান করছিলে। অতএব তোমরা আত্ম প্রশংসা করোনা।[1]

আমাদের মাঝে অনুভূতির যন্ত্রটি কাজ করছে। এমনি ভাবে মাংশপেশী, হাঁড়, হৃদপিন্ড, পাকস্থালীসহ অন্যান্য যন্ত্রগুলি একে অপরের সাথে একই নিয়মে

[1] সূরা যমার, ৬।

[1] সূরা নাজম, ৩২।

নিয়মতান্ত্রিক ভাবে একটি পরিকল্পনার অধীনে মিলেমিশে কাজ করছে, নেই তাতে অসংগতি ও অসামঞ্জস্য।

প্রতিটি সৃষ্টির মধ্যে নির্ধারিত পরিকল্পনা রয়েছে। উক্ত পরিকল্পনার অধীনে একই পদ্ধতিতে সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে সৃষ্টি হয়েছে প্রত্যেক জীব। মহাবিশ্বে কোন বিশৃংখলা নেই। এর প্রত্যেকটিই সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, সৃষ্টিকর্তা একও অদ্বিতীয়। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ . الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ . فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ . سورة الإنفطار : ٦-٨

'হে মানুষ! কিসে তোমাকে তোমার মহামহিম পালনকর্তা সম্পর্কে বিভ্রান্ত করল? যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন অতঃপর তোমাকে সুবিন্যাস্ত এবং সুষম করেছেন। তিনি তোমাকে তাঁর ইচ্ছা মত আকৃতিতে গঠন করেছেন। [2]

ফুসফুস ও আল্লাহর একত্ববাদ

মানব দেহের প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আল্লাহ তাআলার কুদরতের সাক্ষ্য বহন করে। মূলতঃ মানুষকে এ ব্যাপারে অতি সামান্য জ্ঞান দান করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. الإسراء : ٨٥

'এ বিষয়ে তোমাদেরকে সামান্য জ্ঞানই দান করা হয়েছে। [3]

আমাদের শরীরের আভ্যন্তরীণ যে সমস্ত অংশ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত স্বজ্ঞানে, অজ্ঞানে, জাগ্রত ও ঘুমন্ত অবস্থায় একাদারে বিরতিহীন ভাবে কাজ করে যাচ্ছে তন্মধ্যে ফুসফুস একটি।

এই শ্বাস প্রশ্বাস যন্ত্রটি আল্লাহর অশেষ করুণা ও অলৌকিক সৃষ্টি। সব সময় অক্সিজেন গ্রহণ করতঃ রক্তের মাধ্যমে কোষকে সরবরাহ করছে এবং তার থেকে কার্বনডাই অক্সাইড বের করছে। অর্থাৎ তার উপশিরাগুলো শ্বাস প্রশ্বাসের মাধ্যমে রক্তকে পরিশুদ্ধ করে। একজন মানুষ তার জীবনে গড়ে ৫০কোটি বার শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করে।[4] এই গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রটি মহান স্রষ্টা আমাদের বুকের পিঞ্জড়ার মধ্যে সংরক্ষণ করেছেন। প্রত্যেক মানুষের মাঝে দু'টি করে ফুসফুস রয়েছে। একটি ডান

---

[2] সূরা ইনফিতার,৬-৮।

[3] সূরা বানি ইসরাঈর , ৮৫।

[4] মাসিক সংস্কার ৫/১২।

পার্শ্বে, আর আপরটি বাম পার্শ্বে। ডান পার্শ্বের ফুসফুসটি বাম পার্শ্বের ফুসফুসের তুলনায় আকারে বড়।

শিশু তার মায়ের পেটে থাকা অবস্থায় শুক্রাণুর একটি অংশ থেকে এমন একটি সূক্ষ্ম যন্ত্র সৃষ্টি হলো যেখানে কোন বাতাসের প্রয়োজন হয়নি। আধুনিক বিজ্ঞান বলছে যে, সেখানে যদি সামান্য পরিমান বাতাসও প্রবেশ করত তাহলে মারত্মক ক্ষতি সাধিত হতো।[1] তাহলে বাতাস গ্রহণের শ্বাস প্রশ্বাসের যন্ত্রটি কেন সেখানে তৈরী করা হলো?

কোন সন্দেহ নেই যে, এই যন্ত্রটি যিনি সেখানে তৈরী করেছেন তিনি অবশ্যই এই শিশুর গন্তব্য স্থানের প্রয়োজনীতা সর্ম্পকে সর্বজ্ঞাতাও বটে। তিনি অবশ্যই জানেন যে, এই শিশু অনতি বিলম্বে মায়ের গর্ভ থেকে এমন এক স্থানে বেরিয়ে আসবে যেখানে সব দিক থেকে তাকে হাওয়া বেষ্টন করে রাখবে। তার সব সময় হাওয়ার প্রয়োজন হবে। এক মুহুর্তও সে হাওয়া বা বাতাসের অক্সিজেন ছাড়া বেঁচে থাকতে পারবে না। অথচ সেই সন্তান এ ব্যাপারে কিছুই জানত না। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ . سورة النجم: ٣٢

'তিনি তোমাদের সম্পর্কে ভাল জানেন, যখন তিনি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যখন তোমরা মাতৃগর্ভে ভ্রুনরূপে অবস্থান করছিলে।'[2]

সেই মহান স্রষ্টা এই পৃথিবীতে আমাদের জন্য বাতাসের ব্যবস্থা করেছেন। তা গ্রহণ অতি সহজ করে দিয়েছেন। তা গ্রহণ করতে আমাদেরকে কোন কষ্ট করতে হয় না, কোন পরিশ্রম করতে হয় না এবং কোন পারিশ্রমিকও দিতে হয় না। অপর দিকে আমরা যে কার্বনডাই অক্সাইড পরিত্যাগ করছি সেগুলো পরিশুদ্ধ করার জন্য গাছপালা ও তরুলতার ব্যবস্থা করেছেন। আবার সেগুলোর মাধ্যমে এই নিয়মে আমরা যথাযথ অক্সিজেন পাচ্ছি। পৃথিবীর সৃষ্টি থেকে এ নিয়মের কোন ব্যতিক্রম নেই। আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

سُنَّةَ اللهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَبْدِيلًا . سورة الفتح: ٢٣

'পূর্ব হতে আল্লাহর এরূপ বিধান চলে আসছে। তুমি আল্লাহর বিধানে কোন পরিবর্তন দেখবে না।[3]

---

[1] তাওহীদুল খালেক, পৃষ্ঠা ৪৬।

[2] সূরা নাজাম , ৩২।

এই মহা বিশ্বের সুশৃংখল নিয়ম নীতি এটাই প্রমাণ করে যে, মহান সৃষ্টিকর্তা এক ও অদ্বিতীয়।

হৃদপিন্ড ও আল্লাহর একত্ববাদ

মানব শরীর সত্যিই এক অদ্ভুত মেশিন। এমন এক মেশিন যার যথার্থ বর্ণনা পেশ করা কোন দিনেই কোন মানব সন্তানের পক্ষে সম্ভব নয়। আর সম্ভব হবেই বা কি করে, এই শরীর তো কোন মানুষ নিজে বানায়নি যে, সে তার নিজস্ব সৃষ্টির যাবতীয় তথ্য ও তত্ত্ব আপনাকে বলে দিবে।[4]

এই দেহের আভ্যন্তরীণ পরিশীলনের কথাই ধরুন না কেন, আমাদের হৃদয় আমাদের বুকের বাম পার্শ্বে সামনের দিকে পেটের একটু উপরে এই ছোট্ট অংশটি হচ্ছে আমাদের দেহের সর্বাধিক জরুরী অংশ।

হার্ট এর দৈর্ঘ হচ্ছে ১২.৫ সেঃ মিঃ, প্রস্থ হচ্ছে ৮.৫ সেঃ মিঃ। জন্মের সময় এর ওজন থাকে ২০-২৫ গ্রাম এবং পুরুষের যৌবনের সময় ওজন হয় ৩১০ গ্রাম এবং মহিলার হয় ২২৫ গ্রাম। হৃদযন্ত্রটি প্রতি মিনিটে প্রায় ৭০টি স্পন্দনের মাধ্যমে ৫ লিটার রক্ত চালিত করে। তাতে দেখা যায়, প্রতিদিন এক লক্ষ স্পন্দনের মাধ্যমে সাত হাজার দুই শত লিটার রক্ত চালিত করে। হৃদপিন্ডের স্পন্দনের মাধ্যমে রক্ত শিরা ও ধমনির মধ্য দিয়ে যে দূরত্ব অতিক্রম করে তা দৈনিক একলাখ কিঃ মিঃ সম পরিমান । সুবহানাকা ইয়া রব!

হৃদপিন্ড থেকে ফুসফুস, তারপর ফুসফুস থেকে হৃদপিন্ডে রক্ত আসা যাওয়ার সময় লাগে ছয় সেকেন্ড। হৃদপিন্ড থেকে ব্রেইন, তার পার আবার ব্রেইন থেকে হৃদপিন্ডে সময় লাগে আট সেকেন্ড। হৃদপিন্ড থেকে পায়ের আঙ্গুল দিয়ে আবার হৃদপিন্ডে ফিরে আসতে সময় লাগে আঠার সেকেন্ড। এ সংখ্যা ও সময় নির্ধারিত ও নির্দিষ্ট। হৃদপিন্ডের চালিকাশক্তি জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বিরতিহীন ভাবে চলছে[2]।

আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ . سورة القمر: ٤٩

'আমি প্রত্যেক বস্তুকে নির্ধারিত ও পরিমিত রূপে সৃষ্টি করেছি। [3]

---

[3] সূরা ফাতহ ২৩।

[4] মাসিক সংস্কার ৫/১২।

[2] তাওহীদুল খালেক, পৃষ্ঠা ১/৪১।

[3] সূরা কামার, ৪৯ ।

হৃদপিন্ড তার সংকোচন ও প্রসারণের মাধ্যমে রক্তস্রোতকে সর্বদা ছড়িয়ে দেয় এবং আবার দেহের সর্বাঙ্গ থেকে সংগ্রহ করে আনে। (ডায়াস্টোল) সম্প্রসারণ অবস্থায় ডান অলিন্দ দেহের বিভিন্ন অংশ হতে আগত অক্সিজেনশূন্য রক্তে এবং বাম অলিন্দ ফুসফুস হতে আগত অক্সিজেন যুক্ত রক্তে পূর্ণ হয়। আধুনিক যুগে বিজ্ঞানের আবিস্কৃত সৃষ্টি সম্পর্কে এ ধরণের তথ্যের প্রতি যখন গভীরভাবে চিন্তা করা হয় তখনই সুস্পষ্টভাবে পরিষ্ফুটিত হয় যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সবকিছু সৃষ্টি করেছেন মানব জাতির কল্যাণের জন্য। আর সেই মুহুর্তেই আমর মাথা মহান আল্লাহর জন্যই মনের অজান্তে আপনা আপনি নুইয়ে আসে এবং কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হয় আল্লাহর বাণী ঃ

صُنْعَ اللهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ . سورة النمل: ٨٨

‘এটা আল্লাহর কারিগরী যিনি সবকিছুকে সুসংহত করেছেন।’[4]

রক্ত ও আল্লাহর একত্ববাদ

রক্ত সর্বদা রক্তনালীর মধ্যে আবদ্ধ থেকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে চলাচল করে। এটি যেন সৃষ্টিকর্তার কুদরতের প্রবাহমান নদী। হৃদপিন্ডের স্পন্দনের মাধ্যমে রক্তনালীর মধ্য দিয়ে ব্রেইন, ফুসফুসসহ শরীরের সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বিরতিহীন ভাবে রক্ত চলাচল করছে। এই রক্ত চলন্ত পথে আমাদের অজান্তে অনেক কাজ করে যাচ্ছে। যেমন লোহিত রক্ত কনিকার হিমোগ্লোবিন বহন করে প্রতিটি কোষে পৌঁছে দেয়। দেহের পরিত্যাজ্য পদার্থ ডাই অক্সাইড ফুসফুসের সাহায্যে এবং ইউরিয়া ইউরিক এসিড ইত্যাদি বৃক্কের সাহায্যে বাইরে নিস্ক্রান্ত করে। দেহের প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রতিটি কলায় রক্ত পুষ্টি বহন করে নিয়ে যায় জীবাণু ধ্বংস করে, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে, উত্তাপের সমতা বজায় রাখে ইত্যাদি।

শরীরতত্ত্ববিদগণ বর্ণনা করেন যে, একজন প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষের রক্তে প্রতি ঘন মিলিমিটারে গড়ে ৫০ লক্ষ রেড ব্লাড সেল বা লোহিত রক্ত কনিকা থাকে। এই সংখ্যা যদি ২৫% হ্রাস পায় তাহলে রক্তাল্পতা দেখা দেয়। আবার যদি প্রতি ঘন মিলিমিটারে উহার সংখ্যা ৬৫ লক্ষের অধিক হয় তাহলে তাকে পলিনাইথেমিয়া বলে।

অপর এক বর্ণনায় রয়েছে। এক একজন মানুষের রক্তে রেড ব্লাড সেল বা লোহিত রক্ত কণিকার পরিমান আড়াই হাজার কোটি, আর হোয়াইট ব্লাড সেলের বয়স মাত্র

---

[4] সূরা নামল, ৮৮।

১২ ঘন্টা। রেড ব্লাড সেলগুলো ১২০ দিন পর্যন্ত বেঁচে থাকে। আরও আশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে যে, আমাদের শরীরে যত শিরা উপশিরা রয়েছে তার সবগুলোকে বাইরে এনে একটার সাথে একটাকে জোড়া লাগিয়ে লম্বা করতে থাকলে এর পরিমান হবে ৬০ হাজার মাইল। অর্থাৎ একটি শরীরের উপশিরা দিয়ে একজন মানুষ গোটা পৃথিবী প্রায় ৩ বার ঘুরে আসতে পারবে। আবার সবগুলোকে পাশা পাশি সাজাতে দেড় একর জমির প্রয়োজন হবে। এর সব শিরাগুলোকে একত্রে খোলা রাখা হয় না। আর যদি খোলা রাখা হয় তাহলে এক সেকেন্ডের চেয়েও কম সময়ের মধ্যে সমস্ত রক্ত শরীর থেকে বেরিয়ে আসবে।

এই সৃষ্টি সম্পর্কে একটু চিন্তা করলেই বুঝতে আর কোন অসুবিধা হয় না যে, তা এক মহা বিচক্ষণ বুদ্ধিমান স্রষ্টা মহান আল্লাহ তাআলারই দান।

আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ . أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ . أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ .

الواقعة : ٥٧-٥٩

‘আমিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি তবে কেন তোমরা তা বিশ্বাস করছ না। তোমাদের বীর্যপাত সম্পর্কে তোমরা কি ভেবে দেখেছ? তোমরা কি তা সৃষ্টি কর,না আমি সৃষ্টি করি?[1]

জিহ্বা ও আল্লাহর একত্ববাদ

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মানুষের জন্য এমন এক যন্ত্র সৃষ্টি করেছেন যার নাম জিহ্বা ।এই জিহ্বার অনেক দায়িত্ব রয়েছে। মানুষ এই জিহ্বা দ্বারা মিষ্টি ও ঝালের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে। লবণ, টক এর মধ্যে পার্থ্যক্য করতে পারে। এক একটি ফলের স্বাদ এক এক ধরনের তাও মানুষ বুঝতে পারে এই ছোট্ট যন্ত্রটির মাধ্যমে। এই জিহ্বা যদি আল্লাহ সৃষ্টি না করতেন তাহলে আমরা কোনক্রমেই সুস্বাদু খাদ্যের স্বাদ গ্রহণ করতে পারতাম না। খাদ্যের অর্থ কি তাও উপলব্ধি করতে পারতাম না। আধুনিক বিজ্ঞান বর্ণনা করছে যে, জিহ্বা আবরণী কলা, পেশী এবং গ্রন্থি নিয়ে গঠিত। জিহ্বা আবরণী কলা কঠিন ও স্তরীভূত। এ কলায় স্বাদকোরক (Test bud) এবং প্যাপিলা থাকে। জিহ্বার অগ্রাংশে মিষ্টতা, পশ্চাদ ভাগে তিক্ততা, দু‘পাশে অম্লতা এবং মধ্যভাগে লবণাক্ততা স্বাদকোরক থাকে।

আধুনিক বিজ্ঞানে আরও বর্ণিত রয়েছে যে, আমরা জিহ্বা দিয়ে যখন কথা বলি তখন তার ১ লক্ষ ১৭ হাজার সেল একত্রে এসে এমন ভাবে আমাদের কথাগুলোকে

[1] সূরা ওয়াকিয়া, ৫৭-৬০।

সাজিয়ে দেয় যাতে কোন কথার সাথে কোন কথার সংঘাত না হয়। কে সেই মহান সৃষ্টি কুশলী, মানুষ ছাড়া যিনি অন্য কোন প্রাণীর জিহ্বায় এ সেলগুলো তৈরী করেননি?

এমন ভাবে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষের শরীরের মধ্যে তার অস্তিত্বের বহু নিদর্শন রেখে দিয়েছেন। বিস্ময়ে অবাক হতে হয় যখন কেউ গভীর বিশ্লেষণ করলেই সেই স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাস করতে বাধ্য হতে হয়।

বৃক্ক (Kidney) ও আল্লাহর একত্ববাদ

আমরা সব সময় সর্বাবস্থায় মহান সৃষ্টিকর্তার নিয়ামতের মধ্যে ডুবে আছি। এক মুহুর্তের জন্যও তাঁর করুণা ও দয়া ছাড়া বেঁচে থাকা সম্ভব নয়।

এখানে আমাদের কিডনীর কথাই ধরুন না কেন। আধুনিক শরীরতত্ত্ববিদরা কিডনীকে দেহের আন্তঃ দেশীয় সাম্যাবস্থা বজায় রাখার মুখ্য অঙ্গ রূপে বর্ণনা করেছেন। শরীর থেকে যদি অনবরত পানি বেরিয়ে যেতে থাকে তাহলে দেহ শুষ্ক হয়ে মৃত্যু অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়। অপর দিকে দেহের শতকরা ৭৫ ভাগ বিপাক জাত দূষিত পদার্থগুলো কিডনীর মাধ্যমে নিস্কাশিত হয়।

এসব দূষিত পদার্থ দেহের পক্ষে ক্ষতিকর। কাজেই উৎপন্ন হওয়ার সাথে সাথে এদের অপসারণ একান্ত প্রয়োজন। মানুষের শরীরে দু'টি করে কিডনী রয়েছে। প্রতিটি কিডনীর দৈর্ঘ্য প্রায় ১১ সেন্টিমিটার, প্রস্থে প্রায় ৫সেস্টিমিটার এবং পুরুত্বে প্রায় ৩ সেন্টিমিটার। পুরুষের কিডনীর ওজন ১২৫-১৭০ গ্রাম এবং মেয়েদের কিডনীর ওজন ১১৫- ১৫৫ গ্রাম। এক একটি কিডনী প্রায় ১০ লক্ষ নেফ্রন (সূক্ষ্ম চুলের ন্যায় কুন্ডলীকৃত নালিকা) নিয়ে গঠিত। প্রতিটি নেফ্রনের গড় দৈর্ঘ্য প্রায় ৫ cm। দু'টি কিডনীর সব নেফ্রন (২০ লক্ষ) পর পর যোগ করলে প্রায় ৯৪০ মাইল লম্বা হবে। নেফ্রন হচ্ছে বৃক্কের গঠতান্ত্রিক ও কার্জ সম্পাদনকারী একক। আধুনিক বিজ্ঞান আরও বর্ণনা করছে যে, কিডনীতে প্রতি মিনিটে প্রায় ১ ml মূত্র প্রস্তুত হয়। এ মূত্র কিডনী থেকে মূত্রনালীর মাধ্যমে বাহিত হয়ে মূত্রাশয়ে সঞ্চিত হয়। এভাবে প্রায় ৭০০ থেকে ৮০০ মিঃলিঃ মূত্র সঞ্চিত হয়। স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র মূত্র ত্যাগ নিয়ন্ত্রণ করে। আল্লাহ আকবার! আপনি কি কখনও ভেবে দেখেছেন যে, কে তিনি যিনি মায়ের উদরে এমন ধরনের সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি সৃষ্টি করেছেন, আপনার সার্বিক হিফাযতের জন্য সার্বক্ষণিক কাজ করে যাচ্ছে।

আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ . يوسف : ٦٤

'অত এব আল্লাহ উত্তম হিফাযতকারী এবং তিনিই সর্বাধিক দয়ালু। [1]

দাঁত ও আল্লাহর একত্ববাদ

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুয়ের শরীরে তাঁর একত্ববাদের হাজার হাজার প্রমাণ ও নিদর্শন রেখে দিয়েছেন। প্রতিটি অঙ্গ আল্লাহর সৃষ্টি এক অতুলনীয় অলৌকিক, কত সামঞ্জস্যপূর্ণ! তাহলে আসুন, এখন নজর দেয়া যাক আমাদের দাঁতের প্রতি। দাঁত যে কত বড় নেয়ামত তা খসে পড়ে যাওয়ার পর মানুষের বুঝে আসে। মায়ের গর্ভ থেকে কেউ দাঁত নিয়ে আসে না ঠিকই, কিন্তু তার সার্বিক কাঠামো তৈরী থাকে। জন্মের সাথে সাথে এই দাঁতের প্রয়োজন হয় না বিধায় মাতৃগভে তা সৃষ্টি করা হয়নি।

আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ . الملك : ١٤

'তিনি কি জানবেন না যিনি সৃষ্টি করেছেন? তিনি সূক্ষ্মজ্ঞানী, সম্যক জ্ঞাত।' [2]

ছয় মাস বয়সে মানব শিশুর প্রথম দাঁত উঠতে আরম্ভ করে। আবার শিশুর ছয় বছর বয়স হলেই এই দাঁত দাঁতগুলো পড়ে যায় এবং পরে স্থায়ী দাঁত গজায়। আপনি কি কখন ভেবে দেখেছেন যে, কে তিনি, যিনি আপনার নিচের মাড়ির দাঁতগুলো উপরের দিক আর উপরের মাড়ির দাঁতগুলো নিচের দিক করে দিলেন? কে তিনি যিনি একই মাপের দাঁত পরস্পর বিপরীত পাশে সংযোগ করে দিলেন? উপরের চোয়ালের দাঁতগুলো যদি উপরের দিকে গজিয়ে নাকের ভিতর দিয়ে বের হতো তাহলে আপনার চেহারা কেমন দেখা যেত, একটু কল্পনা করুন তো? কোন সন্দেহ নেই, তিনি সেই আল্লাহ ঃ

الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى. وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى . الأعلى : ٢-٣

'যিনি সৃষ্টি করেছেন ও সুবিন্যাস্ত করেছেন এবং যিনি সুপরিমিত করেছেন এবং পথ প্রদর্শন করেছেন।' [3]

অপর দিকে যদি চুল ও নখের মত দাঁত বৃদ্ধি পেতেই থাকত তাহলে কতই না বিশ্রী চেহারা হতো। শুধু তাইনয়, বরং দাঁত সৃষ্টির প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যাহত হতো। স্রষ্টা যে

---

[1] সূরা ইউসুফ, ৬৪।

[2] সূরা মুলূক,১৪।

[3] সূরা আলা, ২-৩।

কাজের জন্য যাকে সৃষ্টি করেছেন তাকে সে কাজে পথ নির্দেশও দিয়েছেন। কুরআনে বর্ণিত হচ্ছেঃ

رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى . طه : ٥٠

'আমাদের পালনকর্তা তিনি, যিনি প্রত্যেক বস্তুকে তার যোগ্য আকৃতি দান করেছেন, অতঃপর তার সংশ্লিষ্ট কাজের পথ নির্দেশ দিয়েছেন।[4] এই বিস্ময়কর সামঞ্জস্যপূর্ণ মিল স্রষ্টার রহস্য সৃষ্টিতে বৈজ্ঞানিক বিচার বিশ্লেষণের দ্বারা দেখতে পাচ্ছে আল্লাহর একত্বের অকাট্য দলীল।

পরিপাকতন্ত্র ও আল্লাহর একত্ববাদ

আল্লাহর সৃষ্টি কোন জিনিসকে খাটো করে দেখার কোন সুযোগ নেই। পরিপাকতন্ত্র মানব জীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এটির মাধ্যমে মানুষ খাদ্য গ্রহণ করে এবং গৃহীত খাদ্যের পরিপাক আত্তীকরণের মাধ্যমে দেহের বৃদ্ধি ঘটায় এবং স্থৈতিক শক্তি অর্জন করে এবং খাদ্যের অপাচ্য অংশ পায়ুপথ দ্বারা বাইরে নিস্ক্রান্ত করে।

পরিপাকতন্ত্রের বিভিন্ন অংশ হল মুখ, গলবিল, অন্ননালী, পাকস্থলী, ক্ষুদ্রান্ত্র, বৃহদান্ত্র প্রভৃতি। আনুষঙ্গিক গ্রন্থি হচ্ছে লালা গ্রন্থি, যকৃৎ এবং অগ্নাশয়। এদের সাথে সহযোগিতা করে প্লীহা। এই অংশগুলোর প্রত্যেকটির দায়িত্ব রয়েছে। এ দায়িত্ব পালনে তাদের পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতার সম্পর্ক ও যোগাযোগ রয়েছে।

মুখ হল পৌষ্টিক নালীর প্রবেশ দ্বার। মুখ দিয়ে খাদ্য দেহাভ্যন্তরে গৃহীত হয়। খাদ্য অভ্যন্তরে প্রবেশের পূর্বেই দাঁতের মাধ্যমে কেঁটে ছোট টুকরায় পরিণত করে যাতে সহজেই হজম হতে পারে।

অপর দিকে জিহ্বা এগুলোকে ওলট পালট করার মাধ্যমে মুখের লালা দিয়ে সংমিশ্রন ঘটায় যা দ্রুত হজমের সহায়তা করে। অতঃপর সেগুলো গলবিল হয়ে কন্ঠনালীতে পৌছে দেয়। আবার সেখানে রয়েছে ইপিগ্লটিস নামক ট্রাফিক পুলিশ যা অন্ননালীর পথ খুলে দেয়, আর হাওয়া প্রবেশের পথ বন্ধ করে রাখে । এমনিভাবে খাদ্য পাকস্থলিতে পৌঁছে। সেখানে খাদ্যবস্তুর সাথে গৃহীত ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করে এবং জটিল খাদ্যকে সরল খাদ্যরসে পরিণত করে। আবার ক্ষুদ্রান্ত্র খাদ্য বস্তুর পরিপাকে এবং শোষনে সাহায্য করে। তারপর অবশিষ্ট অংশ বৃহদন্ত্রে পৌঁছে দেয় এবং মলাশয় পায়ুছিদ্রের মাধ্যমে মল বাইরে নিষ্ক্রান্ত করে। পরিপাক গ্রন্থির মধ্যে লিভার একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থি। এটি অসংখ্য রাসায়নিক ক্রিয়া সম্পন্ন করে। তাই

[4] সূরা ত্বাহা , ৫০।

একে মানব দেহের বিজ্ঞানাগার বলে। এই লিভারের মাধ্যমেই বিভিন্ন খাদ্য উপাদান সমূহের বিপাক প্রক্রিয়া সংগঠিত হয়ে শরীরের কোষ সমূহকে কার্যক্ষম ও সুস্থ্য রাখার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় খাদ্য নির্যাসের যোগানের ব্যবস্থা হয়। লিভারের নীচে একটি পিত্ত থলি রয়েছে। আধুনিক বিজ্ঞান বর্ণনা করছে যে, সারা দিনে মানবদেহ ৫০০-১০০০ ml পিত্ত নিঃসৃত করে। পিত্তরস ক্ষার জাতীয় তরল পদার্থ যা হজমে সাহায্য করে, রক্তে শর্করার পরিমান নিয়ন্ত্রণ করে ও রক্ত হতে ক্ষয় প্রাপ্ত হিমোগ্লোবিন অপসারণ করাসহ অন্যান্য দায়িত্ব পালন করে। অপর দিকে লিভার রক্ত হতে অপ্রয়োজনীয় উপাদান অপসারণ করে প্রয়োজনীয় উপাদানের ঘাটতি পূরণ করে,ব্যাকটেরিয়া ধবংস করে, রোগ জীবাণু দূর করে দেহের তাপ নিয়ন্ত্রণে সহায়াতা করে, পানি ও লবণের সমতা আনে, লৌহ সঞ্চয় করে হিমোগ্লোবিন গঠনে সহায়তা করা সহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে আমাদের শরীরে। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আমাদের অজান্তে একই ব্যবস্থাধীনে সুচারু রূপে পরিচালিত হচ্ছে। এই সুশৃংখল পরিচালনা শক্তি স্বয়ং আল্লাহর একত্বের সবচেয়ে বড় প্রমাণ।

বিবেক বুদ্ধি ও বিচক্ষণতা কাজে লাগালে কখনও এ কথা সত্যে প্রমাণিত হয় না যে, এই বিশ্বের জন্য একাদিক সৃষ্টিকর্তা থাকতে পারে যারা স্বতন্ত্র ব্যবস্থার মালিক। এর অবশ্যম্ভাবী ফল হলো, তাদের পারষ্পরিক দ্বন্দ্ব-বিরোধ এবং একে অন্যের উপর প্রাধান্য লাভ করার চিন্তা ভাবনা, যা বিশ্বের বিশৃংখলা, বিপর্যয় ও ধ্বংসরূপে আত্মপ্রকাশ করে। অথচ এ বিশ্বে আমরা এমন কোন বিশৃংখলা দেখি না। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

لَوْ كَانَ فِيهِمَا آَلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ . الأنبياء : ٢٢

'যদি আসমান ও যমীনে আল্লাহ ব্যতীত অন্যান্য উপাস্য থাকত তাহলে তাতে বিশৃংখলা দেখা দিত।' [1]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন ঃ

مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ . المؤمنون : ٩١

'আল্লাহ কোন সন্তান গ্রহণ করেননি এবং তাঁর সাথে অপর কোন মাবুদ নেই। যদি থাকত তাহলে প্রত্যেক মাবুদ নিজ নিজ সৃষ্টি নিয়ে পৃথক হয়ে যেতো এবং একে অপরের উপর প্রাধান্য বিস্তার করত। তারা যা বলে আল্লাহ তা হতে পবিত্র। [2]

---

[1] সূরা আম্বিয়া ২২।

[2] সূরা মুমিনুন,৯১।

নাক ও আল্লাহর একত্ববাদ

মহান স্রষ্টার অসংখ্য কুদরতের মধ্যে নাক একটি। মায়ের উদরে গভীর আধারে সৃষ্টি করেছেন তিনি এই নাক। আপনি যদি আপনার নাকের প্রতি নজর করেন তাহলে দেখতে পাবেন যে, নাক তার দায়িত্বের সাথে কত সামঞ্জস্য। দুই চোখের মধ্যবর্তী স্থান দিয়ে দুটি ছিদ্রের মাধ্যমে হাওয়া প্রবেশ করে। কিন্তু সেই মহা বিজ্ঞ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন হাঁড় ও মাংস দিয়ে ঢেকে দিয়েছেন। নাকের উপরিভাগটি হাঁড় দিয়ে তা ঢেকে দিয়েছেন যাতে বাতাসের চাপে ছিদ্র দু'টি বন্ধ হয়ে শ্বাস প্রশ্বাসের ব্যাঘাত সৃষ্টি না হয়। একই ভাবে নাকের হাঁড়গুলো চক্ষু সংরক্ষণে অংশ গ্রহণ করছে। নাককে প্রতিপালকের সৃষ্টি অলৌকিক এয়ারকন্ডিশন বলা হয়, যার মাধ্যমে হাওয়াকে ঠান্ডা করা হয়। এখানেই শেষ নয়, বরং তিনি এর মধ্যে এমন যন্ত্র স্থাপন করেছেন যার মাধ্যমে ধুলাবালি ও রোগ জীবানু আটকা পরে এবং সেগুলি ভিতরে প্রবেশের সময় বাধা প্রদান করে। আধুনিক বিজ্ঞানে প্রকাশ যে, নাসাপথ পিচ্ছিল এবং লোমাবৃত হওয়ায় শ্বাস গ্রহণের সময় মশা-মাছি, ধূলাবালি প্রবেশ করতে পারে না। আরও বর্ণিত আছে, নাসানন্ধ্রের ভিতর কোন ক্ষতিকারক কিংবা অবাঞ্ছিত বস্তু ঢুকলে সয়ংক্রিয়ভাবে অনৈচ্ছিক হাঁচির সৃষ্টি হয়। আর হাঁচির মাধ্যমে নাকের মধ্যে জমে থাকা ধূলা-বালি এবং বোগ জীবানু বের হয়ে যায়। হাঁচির হাওয়া এত জোরালো হয় যে, সেখানে কোন জীবানু আটকে থাকার সুযোগ পায় না। যদি এই জীবানু এবং ধূলা-বালি ভিতরে প্রবেশ করে তাহলে অগণিত রোগের কারণ হতে পারে। এরূপ বহু রোগ রয়েছে যা নিঃশ্বাসের মাধ্যমে ছড়ায় এবং পরে তা ভয়াবহ আকার ধারণ করে। আল্লাহ তাআলা এ সকল রোগ প্রতিরোধের জন্য প্রতিষেধক হিসাবে হাঁচির ব্যবস্থা করেছেন। নাসাপথ মুখবিবরের শেষ প্রান্তে তালুতে দু'টি ছিদ্রের মাধ্যমে উন্মুক্ত থাকে। খাদ্য গ্রহণের সময় উক্ত ছিদ্র দু'টি আলজিব (uvula) নামক ঢাকনা দিয়ে ঢাকা থাকে যাতে সেখানে সহজে খাদ্য প্রবেশ করতে না পারে। খাদ্যনালী ও শ্বাসনালী একই স্থানে রয়েছে। খাদ্যনালীর মাধ্যমে খাদ্য পাকস্থলীতে প্রবেশ করছে। আর শ্বাসনালীর মাধ্যমে হাওয়া পৌঁছে যাচ্ছে ফুসফুসে। অথচ খাদ্য ও হাওয়া প্রবেশের ব্যাপারে কোন ধরণের ভুল হচ্ছে না। নিশ্চয়ই এটা সৃষ্টির মাঝে স্রষ্টার কুদরত।

আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى . قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى . المؤمن : ٤٩-

٥٠

'সে বললঃ হে মূসা! তোমাদের পালনকর্তা কে? তিনি বললেনঃ আমাদের পালনকর্তা তিনি, যিনি প্রত্যেক বস্তুকে তার যোগ্য আকৃতি দান করেছেন, অতঃপর পথ প্রদর্শন করেছেন।'[1] আল্লাহ এই দুই প্রবেশ পথের মাঝে একটি গার্ড রেখে দিয়েছেন যার নাম ইপিগ্লটিস(epiglotis) । আমাদের কেউ যদি ফুসফুসে কোন ধরনের খাদ্য অথবা পানীয় প্রবেশ করাতে চেষ্টা করেন তখন এই ইপিগ্লটিস তাতে বাধার সৃষ্টি করে শ্বাসনালী সম্পূর্ণ বন্ধ করে রাখে। আবার যদি কেউ জোর পূর্বক পাকস্থলীতে হাওয়া প্রবেশ করাতে চেষ্টা করে তাহলে সেখানে এই ইপিগ্লটিস তা প্রবেশ করতে দেয় না। আল্লাহু আকবার!

আমরা সকলে আরও জানি যে, এই নাকের মাধ্যমে মানুষ বিভিন্ন গন্ধ পার্থক্য করে থাকে। এক মাত্র এই নাকেই বুঝতে পারে কোনটি সুগন্ধ, আর কোনটি দুর্গন্ধ। আধুনিক বিজ্ঞান বলছে যে, নাকের ভিতরে পর্দায় এমন এক মেডিসিন সৃষ্টি করা আছে যার কারণেই মানুষ এই পার্থক্য নির্ণয় করতে সক্ষম। কেউ কি কখনও ভেবে দেখেছে, কে তিনি যিনি প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই একই নিয়মে সুনিপুণ ভাবে এমন যন্ত্রের সৃষ্টি করেছেন? নিশ্চয়ই তিনিই সেই মহান আল্লাহ যিনি এক ও অদ্বিতীয়; যিনি অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত সব কিছুই অবগত আছেন। তিনি যদি আমাদের মাঝে এমন সূক্ষ্ম যন্ত্র সৃষ্টি না করতেন তাহলে আমরা কখনই উপলব্ধি করতে পারতাম না যে, এখানে সুগন্ধ ও দুর্গন্ধ বলে কিছু আছে। এবং বিভিন্ন খাদ্যের ঘ্রানের স্বাদ উপভোগ করতে পারতাম না। পারতাম না কোন ফুলের ঘ্রান গ্রহণ করতে।

আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ (سورة لقمان ١١)

'এটা আল্লাহর সৃষ্টি। আল্লাহ ছাড়া যারা রয়েছে তারা কি সৃষ্টি করেছে তা আমাকে দেখাও।'[2]

কর্ণ ও আল্লাহর একত্ববাদ

কর্ণ আল্লাহর সৃষ্টি মানুষের জন্য অপূর্ব নেয়ামত, তার কুদরতের নিদর্শন। এমন ধরনের অসখ্য নেয়ামত মানুষের শরীরে প্রতিনিয়ত তার সেবায় নিয়োজিত রয়েছে। মানব জাতির জ্ঞান বুদ্ধি বিকাশের সাথে সাথে তা পদে পদে উপলদ্ধি করতে সক্ষম হচ্ছে। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. النحل : ١٨

[1] সূরা তা-হা ৪৯-৫০।
[2] সূরা লোকমান, ১১।

'যদি তোমরা আল্লাহর:নেয়ামত গণনা কর তাহলে তা শেষ করতে পারবে না।' [3]
আমরা এই কান দ্বারা অন্যের কথাবার্তা, সুমধুর কণ্ঠসহ সব ধরনের শব্দ শুনতে পাই। আমরা কি কখনও ভেবে দেখেছি যে, কিভাবে আমরা তা শুনতে পাই? কর্ণ ছত্র শব্দ তরঙ্গ কেন্দ্রীভূত করে কর্ণকুহরে প্রবেশ করায়। তারপর কর্ণকুহর তা টিম্পেনিক (Tympenic) পর্দায় পৌঁছায়। তখন শব্দ তরঙ্গটি স্পন্দিত হতে থাকে, তারপর তা মধ্যকর্ণে প্রবেশ করায়। এমনি ভাবে অন্যান্য কার্য সম্পন্ন হওয়ার পর সেই শব্দ তরঙ্গ যখন শ্রবণ স্নায়ু সাহায্যে মস্তিস্কে পৌঁছায় তখন মানুষ শুনতে পায়। কান দিয়ে হাজার কথা একত্রে শুনি, কিন্তু কে এর ভিতরে ওয়েভগুলোকে সুবিন্যাস্ত করে রাখে?
কে সেই মহান সৃষ্টিকুশলী? সেই মহান স্রষ্টা যদি সৃষ্টির মাঝে এই কর্ণ সৃষ্টি না করার ইচ্ছা করতেন তাহলে এক মানুষ অন্য মানুষের সাথে কোন কথা বলতে পারত না, ভাবের বিনিময় হত না। মানুষের মাঝে কোন ধরনের সাহায্য সহানুভূতির অবস্থা বাস্তবায়িত হতো না। কোন দেশ ও সমাজ প্রতিষ্ঠিত হতো না এ ধরণীতে। প্রত্যেকটি সৃষ্টি প্রত্যেক জাতির লোকদের জন্য, চাই সে সৃষ্টিকর্তাকে অস্বীকারকারী নাস্তিক হোক অথবা তার আনুগত্যকারী মুমিন হোক, একই ভাবে একই নিয়মে সৃষ্টি হচ্ছে। তাদের সৃষ্টি এটাই প্রমাণ করে যে, সৃষ্টিকর্তা এক ও অদ্বিতীয়।
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার হাবীব রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآَيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ. الأنعام: ٤٦

'তুমি জিজ্ঞেস কর, আল্লাহ যদি তোমাদের শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নেন এবং তোমাদের অন্তরে মোহর এটে দেন তাহলে ঐ শক্তি তোমাদেরকে আবার দান করতে পারে এমন কোন ইলাহ আল্লাহ ব্যতীত আছে কি? লক্ষ্য কর,আমি আমার নিদর্শনসমূহ কিভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বর্ণনা করি। এর পর ও তারা তা হতে বিমূখ হচ্ছে।[1]

হাঁড় ও আল্লাহর একত্ববাদ

অত্যাধুনিক সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে প্রমাণিত যে, মানুষ ও জীব জগতের সৃষ্টি তথ্য নির্ভুল ভাবে বর্ণিত হয়েছে আল কুরআনে।

---

[3] সূরা নাহল , ১৮।
[1] সূরা আন' আম, ৪৬।

আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ . الطين : ٤

'আমি মানুষকে সুন্দরতম আকার আকৃতিতে সৃষ্টি করেছি।'[1]
মানুষকে আল্লাহ তাআলা সমস্ত সৃষ্টি বস্তুর মধ্যে সর্বাধিক সুন্দর করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টি বস্তুর মধ্যে মানুষ অপেক্ষা সুন্দর কেউ নেই। এবং সেই মহান করুণাময়ের অশেষ করুণায় মানুষকে সকল সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। তাকে জ্ঞান বুদ্ধি, শক্তি বল, ও কলা-কৌশল শিক্ষা দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا . الإسراء : ٧٠

'আমি তাদেরকে সৃষ্ট বস্তুর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।'[2]
আজ যদি আমরা মানবদেহের গঠন প্রনালী নিয়ে চিন্তা করি তাহলেও আমাদের কাছে এ বিষয়টি দিবালোকের মত সুস্পষ্ট হবে। আধুনিক বিজ্ঞানে প্রকাশ যে, একটি শিশুর যখন জন্ম হয় তখন তার শরীরে হাঁড়ের পরিমান থাকে ৩০৫টি। তারপরে অবশ্য পরিমান কমে তা ২০৬ এ দাঁড়ায়। ৬৫০টি পেশীর দ্বারা হাঁড়েগুলো বেঁধে রাখা হয়। গিড়ার পরিমান ১শত। পেশীর সাথে যেখানে হাঁড়ের সম্মিলন ঘটে তা থাকে অতন্ত শক্তিশালী। এই আশ্চর্যজনক মেশিনটিকে ঢেকে রাখা হয়েছে একটি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত পোশাক দ্বারা, যার নাম হচ্ছে চামড়া।[3]
বর্তমানে চিকিৎসা বিজ্ঞান বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ পেশ করছে যে, মাতৃগর্ভে সন্তানের মাংস সৃষ্টি হওয়ার পূর্বে হাঁড় সৃষ্টি হয়। অথচ এই তথ্য আজ থেকে ১৪০০ বছর পূর্বে পবিত্র কুরআনে সুন্দর ভাবে বর্ণিত হয়েছে। এ বিষয়টি সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. المؤمنون : ١٤

'অতঃপর সেই মাংসপিন্ড থেকে হাঁড় সৃষ্টি করেছি, অতঃপর হাঁড়কে মাংস দ্বারা আবৃত করেছি, অবশেষে তাকে এক নতুন সৃষ্টিরূপে গড়ে তুলেছি। নিপুনতম সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ কত কল্যাণময়।'[4]

---

[1] সূরা তীন, ৪।
[2] সূরা বনি ইস্রায়িল, ৭০।
[3] মাসিক সংস্কার, ৫/১২।
[4] সূরা মুমিনুন , ১৪।

তিনি মানুষের শরীরের আকৃতি ও গঠন সুন্দর করার জন্য হাঁড় সৃষ্টি করেছেন। ঘরের কাঠামো যেমন, শরীরের হাঁড়গুলো তেমন। যদি এই হাঁড় না হতো তাহলে মানুষ একটি জমাট মাংসে পরিণত হতো। অপর দিকে যদি এই হাঁড়গুলো আলাদা না হয়ে একটি মাত্র হাঁড় হতো তাহলে মানুষ তার স্থান থেকে উঠতে পারত না। এমন কি তার আংগুলগুলি নড়াচড়া করতে পারত না। মানুষের অবস্থা একটি লোহার টুকরার ন্যায় হয়ে যেত। কিন্তু মহান সৃষ্টিকর্তা তার অশেষ করুণায় যথোপযুক্ত অত্যন্ত সুনিপুণ ভাবে সেগুলো বিভক্ত করে পেশীর দ্বারা বেঁধে অত্যন্ত শক্তিশালী করেছেন। নড়াচড়ায় সহজ ও ঘর্ষণ জনিত আঘাত থেকে রক্ষার জন্য জয়েন্টে সাইনোভিয়াল তরল পদার্থের ব্যবস্থা করেছেন। আল্লহ তাআলা বলেনঃ

وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. البقرة: ٢٥٩

'তুমি হাঁড়গুলোর দিকে চেয়ে দেখ যে, আমি ওগুলোকে কেমন করে সংযুক্ত করি, অতঃপর সেগুলোর উপর মাংসের আবরণ পরিয়ে দিই।'[1]

আমরা কি কখনও চিন্তা করেছি যে, কে সেই ইঞ্জিনিয়ার যিনি মায়ের উদরে গভীর আধারে শুক্রাণু থেকে এতো সুন্দর মানব সৃষ্টি করলেন কোন সন্দেহ নেই যে, তিনিই সেই মহান করুণাময় যাঁর কোন শরীক নেই।

শরীরের ত্বক ও আল্লাহর একত্ববাদ

আমাদের শরীরের চামড়া বা ত্বক আল্লাহর বড় নেয়ামত। করুণাময়ের অশেষ করুণায় এই চামড়া আমাদেরকে রক্ষা করে যাচ্ছে। এটা যেন মানুষের শরীরের বাহিরের নিতান্ত প্রহরী। বাহিরের হামলা প্রতিহত করছে, আবার শরীরের ভিতরের তরল পদার্থ শরীর থেকে বের হতে বাধা প্রদান করছে। এই ত্বককে বলা হয় অনুভূতি যন্ত্র। শরীরের সাথে যে কোন জিনিস স্পর্শ হওয়ার সাথে সাথে সে অনুভব করতে পারে। এর দ্বারা গরম, ঠান্ডা, নরম, শক্ত, ভারী ও পাতলার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা যায়। মানুষ যে খাদ্য খায় তার মধ্যে অপ্রয়োজনীয় তরল পদার্থগুলো এই ত্বকের মাধ্যমে ঘাম আকারে বের হয়।

আধুনিক বিজ্ঞানে প্রকাশ যে, গড়ে একজন মানুষের শরীরে এই চামড়ার পরিমান হচ্ছে ২০ বর্গ ফুট। এর উপরি ভাগে আবার রয়েছে এক কোটি লোমকুপ। আমাদের

---

[1] সূরা বাকারা, ১৫৯।

রুচিবোধের জন্য কোনটা আমরা পছন্দ করি, আর কোনটা অপছন্দ করি, এটা বলে দেয়ার জন্য রয়েছে ৯ হাজার ছো সেল। এগুলোকে যথারীতি সাহায্য করার জন্য রয়েছে আরও ১ কোটি ৩০ লাখ নার্ভ সেল। শরীরের বাইরের বস্তুগুলোর অনুভূতির জন্য সংযোগ করে রাখা হয়েছে ৪০ লাখ বহির্মুখী সেল। এগুলোই আমাদেরকে বলে দেয় কোনটি গরম, কোনটি ঠান্ডা, কোনটি কষ্ট লাগে, আর কোনটিতে আরাম অনুভূত হয়।

আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান এ সিদ্ধান্তে উপণীত হয়েছে যে, কোন ব্যথা বেদনা তা কোন আঘাতের কারণে হোক অথবা অগ্নিদাহ, অত্যাধিক গরম কিংবা অত্যাধিক শীতের কারণে হোক তা শুধু ত্বকই অনুভব করে থাকে অর্থাৎ যদি শরীরে কোন একটি সূঁচ ঢুকানো হয় তাহলে শুধু চামড়ার উপরিভাগ ব্যথা অনুভব হবে। যদি এই চামড়া অতিক্রম করে গোশতের ভিতরেও চলে যায়, তাহলেও মূলতঃ গোশত বেদনা অনুভব করবে না। জনৈক ডাক্তার বলেনঃ

ত্বকের সাতটি স্তর রয়েছে। এগুলির প্রথমটি হচ্ছে ডারমিস (Dermis) ও দ্বিতীয়টি হচ্ছে ইপিডারমিস। (Epidermis) এ দু'টি যদি সম্পূর্ণ পুড়ে যায় তাহলে অন্য স্থান থেকে চামড়া কেটে সেখানে লাগাতে হয়। ত্বক পুড়ে যাবার পর তার অবস্থা পরীক্ষা করার জন্য প্রথমে তুলা দিয়ে সেই স্থানটি স্পর্শ করা হয়। রুগী যদি কিছুই অনুভব করতে না পারে তখন একটি সূঁচ আস্তে আস্তে প্রবেশ করানো হয়। তাতেও যদি সে অনুভব করতে না পারে তখনই অন্য জায়গা থেকে চামড়া কেটে সেখানে লাগানোর প্রয়োজন হয়। এ সত্য যদিও বিজ্ঞানের অত্যাধুনিক আবিস্কৃত তথ্য, কিন্তু কুরআন সে দিকে অনেক আগেই ইঙ্গিত করেছে। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآَيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا

لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا . النساء : ٥٦

'নিশ্চয়ই যারা আমার নিদর্শনকে অস্বীকার করবে অনতি বিলম্বে আমি তাতেরকে আগুনে নিক্ষেপ করব। যখন তাদের চামড়াগুলো বিদগ্ধ হবে, জ্বলে পুড়ে গলে যাবে। তখন আবার আমি তাদের চামড়াগুলো পরিবর্তন করে দিব যাতে তারা আযাব আস্বাদন করতে থাকে। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহা পরাক্রমশালী ও হিকমতের অধিকারী।' [1]

হাতের রেখা ও আল্লাহর একত্ববাদের সাক্ষ্য

[1] সূরা নিসা, ৫৬।

বর্তমানে চিকিৎসা বিজ্ঞান প্রকাশ করেছে যে, আমাদের মধ্যে প্রত্যেক মানুষের আঙ্গুলে এমন ধরনের বিশেষ অংকন বা দাগ রয়েছে সেগুলো এমন বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন যে, একজনের আঙ্গুলের দাগের সাথে অন্যজনের আঙ্গুলের দাগের কোনই মিল নেই। অথচ পবিত্র কুরআনে চৌদ্দ শত বছর পূর্বে তার ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ . بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ . القيامة : ٣-٤

'মানুষ কি মনে করে যে, আমি তার অস্থি সমূহ একত্রিত করতে পারব না? বস্তুতঃ আমি তার আঙ্গুলের অগ্রভাগ পর্যন্ত সঠিকভাবে পুনঃ বিন্যস্ত করতে সক্ষম। [1]

সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো, মানুষ এই হাত দিয়ে সারা জীবন কাজ করে যাচেছ, তবুও তাদের হাতের চামড়া এবং তাতে অঙ্কিত রেখা সারা জীবনেও ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। আল্লাহু আকবার! এ সব ব্যাপারে যদি সামান্য জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিও একটু চিন্তা করে তাহলে তার কাছে অবশ্যই পরিষ্ফুটিত হবে যে, স্রষ্টা এক,অদ্বিতীয় ও মহাজ্ঞানী।

খাদ্য ও আল্লাহর একত্ববাদ

সেই মহান প্রজ্ঞাময় রাব্বুল আলামীন এ ধরণীতে মানুষ সৃষ্টি করে তার জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সব কিছুর ব্যবস্থা করেছেন। তিনি যেমন সৃষ্টিকর্তা তেমনি রিয্কদাতা ও পালনর্তা তিনি বলেনঃ

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللهِ رِزْقُهَا . هود : ٦

'পৃথিবীতে বিচরণশীল এমন কোন প্রাণী নেই যার জীবিকার দায়িত্ব আল্লহর উপর নয়। [2]

আমাদের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত একমাত্র তিনিই আমাদের রিযিক দিয়ে যাচ্ছেন। আমরা কি কখনও ভেবে দেখেছি, সেই মহান স্রষ্টা কিভাবে এই খাদ্য তাঁর কুদরতের অটোমেটিক মেশিনে তৈরী করে আমাদের জন্য পরিবেশন করেছেন?। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ . عبس : ٢٤

মানুষ তার খাদ্যর প্রতি লক্ষ্য করুক। [3]

---

[1] সূরা কিয়ামাহ, ৩-৪।

[2] সূরা হুদ, ৬।

[3] সূরা আবাসা,২৪।

এ আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মানব জাতিকে তার খাদ্য সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা ও গবেষণা করতে বলেছেন। যদি কোন মানুষ খাদ্য সম্পর্কে সঠিক ও গভীর ভাবে চিন্তা ভাবনা করে তাহলে তার ঈমান ও বিশ্বাস সুদৃঢ় হবে যে, আল্লাহই একমাত্র রিয্কদাতা। তিনি এক ও অদ্বিতীয়, তাঁর কোন শরীক নেই। মানুষ যখন মায়ের উদরে থাকে তখনও আল্লাহ তাকে সেখানেই তার নাভির মাধ্যমে খাদ্যের ব্যবস্থা করেন। এমন কি শুক্রাণু যখন ডিম্বাণুতে আঘাত হেনেছিল তখন থেকে শুরু করে তারপর এই উর্বরতা প্রাপ্ত ডিম্বাণু ও তার নিজস্ব বৃদ্ধির জন্য জরায়ু গহ্বরের পুরু স্তরের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পুষ্টি সরবরাহ করেছেন। আল্লাহ ছাড়া কেউ সেখানে পারেনি কোন সাহায্য পৌঁছাতে। না পেরেছে তার পিতা, না পেরেছে কোন সরকার , এমনকি সে যে মায়ের পেটে অবস্থান করেছে সেই মাতাও পারেনি তাকে কোন খাদ্য দিতে। কিন্তু মহান করুণাময় রিয্কদাতা শিশুর মায়ের পেট থেকে বের হওয়া পর্যন্ত দীর্ঘ নয় মাস তাকে তার নাভির মাধ্যমে তার রির্যক পরিবেশন করেছেন।
যখন সে মায়ের পেট থেকে বাইরে এসেছে, তার নাভি কেটে দেয়া হয়েছে, তখন মুখ নামক এমন এক নতুন রাস্তা খুলে দিয়েছেন যার মাধ্যমে ঐ স্থানে খাদ্য পৌঁছেছে যে স্থানে নাভির মাধ্যমে খাদ্য পৌছেছিল।
সেই মহান স্রষ্টা জানেন যে, এই নবজাত শিশু খাদ্য খেতে পারবে না। তাই তিনি তার মায়ের স্তনে দুধের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। অথচ বাচ্চা জন্মের পূর্বে সেই স্তনে কোন দুধ ছিল না। শিশু ভূমিষ্ট হওয়ার সাথে সাথে সেখানে দুধের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন তিনি। অথচ শিশুটি সেই মুহুর্তে কিছুই জানত না। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا. النحل: ٧٨

‘ আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের মায়ের গর্ভ থেকে বের করেছেন। তোমরা কিছুই জানতেনা।’ [1]
যিনি কারো কোন প্রচেষ্টা ছাড়াই আমাদের মায়ের পেটে আমাদের রিযকের ব্যবস্থা করেছেন, আমাদের জন্মের পরও রিযকের ব্যবস্থা করেছেন তিনি অবশ্যই পারেন বাকী জীবনে সার্বিক রিয্ক দিতে। তারপরও কেন আমরা রিযকের জন্য হারাম পদ্ধতি অবলম্বন করি? আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. البقرة: ١٦٨

[1] সূরা নাহাল, ৭৮।

'হে মানুষেরা! পৃথিবীর হালাল ও পবিত্র বস্তু আহার কর। আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করোনা, সে নিঃসন্দেহে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। [1]

অপর দিকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন আমাদের খাদ্য, যা আমরা খাচ্ছি। এই খাদ্য আবার রক্ত মাংসে পরিণত হচ্ছে। আধুনিক বিজ্ঞান এ ব্যাপারে বর্ণনা করছে যে, পানি ও বাতাস কার্বন ডাই অক্সাইড এ পরিবর্তন হচ্ছে এবং সূর্যের তাপ উদ্ভিদের মধ্যে সুগার পরিবর্তন হচ্ছে। প্রায় চল্লিশটি পর্ব অতিক্রম হয়ে সবুজ কারখানায় এ সুগার পরিণত হয়। তারপর এই সুগারের অংশটি ফলে পরিণত হচ্ছে।

বিজ্ঞানীগণ আরও বর্ণনা করেন যে, উদ্ভিদ যখন পানি শোষন করে নেয় তখন তার মধ্যে সবুজ রং এর উপাদান তৈরী হয়। ইংরেজীতে ওকে ক্লোরোফিল বলা হয়। এটাই সেই উপাদান যার দ্বারা উদ্ভিদের বীজ ও ফল সৃষ্টি হয়।

পক্ষান্তরে আমরা যখন এই ফল খাই তখন পাকস্থলীতে হজমের মাধ্যমে তা সুগারে পরিণত হয়। আমরা তা কোষের মাধ্যমে যেভাবে উদ্ভিদের মধ্যে পরিবর্তিত হয়েছে ঠিক তার বিপরীত ভাবে আমাদের শরীরের ভিতরে পরিবর্তিত হয়ে কার্বন ডাই অক্সাইড, পানি ও শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا. الأنعام : ٩٩

'তিনি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন, অতঃপর আমি এর দ্বারা সর্ব প্রকার উদ্ভিদ উৎপন্ন করেছি, অতঃপর আমি তা থেকে সবুজ শাখা বের করেছি, ফলতঃ তা থেকে আমি উপর্যুপরি উত্থিত বীজ উৎপন্ন করে থাকি। [2]

তিনি আরও বর্ণনা করেনঃ

وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ. الحجر: ١٩

'আমি পৃথিবীতে প্রত্যেক বস্তু সুপরিমিত ভাবে উৎপন্ন করেছি।' [3]

আল্লাহর প্রত্যেকটি ব্যবস্থা প্রত্যেক মানুষের জন্য একই ভাবে কার্যকর রয়েছে। আর এটাই প্রমাণ করে যে, মহান সৃষ্টিকর্তা এক ও অদ্বিতীয়। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

---

[1] সূরা বাকারা,১৬৮।

[2] সূরা আন আম, ৯৯।

[3] সূরা হিজর, ১৯

أَفَرَأَيْتُم مَا تَحْرُثُونَ . أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ. الواقعة : ٦٣-٦٤

'তোমরা যে বীজ বপন কর সে সম্পর্কে কি ভেবে দেখেছ? তোমরা তাকে উৎপন্ন কর, না আমি উৎপন্ন করি?' [1]

এই বীজ থেকে অংকুর বের করার ব্যাপারে তোমাদের কতটুকু দখল আছে। চিন্তা করলে এছাড়া জবাব নেই যে, কৃষক ক্ষেতে লাঙ্গল চালিয়ে সার দিয়ে মাটি নরম করেছে মাত্র, যাতে দুর্বল অংকুর মাটি ভেদ করে সহজেই গজিয়ে উঠতে পারে। বীজ বপনকারী কৃষকের সমগ্র প্রচেষ্টা এই একটি বিষয়েই সীমাবদ্ধ। চারা গজিয়ে উঠার পর সে তার হিফাযতে লেগে যায়। কিন্তু একটি বীজের মধ্য থেকে চারা বের করার সাধ্য তার নেই। সে চারাটি তৈরী করেছে বলে দাবীও করতে পারে না। কাজেই প্রশ্ন দেখা দেয় যে, সুবিশাল মাটির স্তুপে পতিত বীজের মধ্য থেকে কে এই সুন্দর ও মহাপোকারী বৃক্ষেকে তৈরী করল? জবাব এটাই যে, সেই পরম প্রভু অপার শক্তিধর আল্লাহ তাআলা অত্যাশ্চর্য কারিগর এর প্রস্তুতকারক।

পবিত্র কুরআনে আরও বর্ণিত হয়েছেঃ

وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ.

الرعد : ٤

'পৃথিবীতে রয়েছে পরস্পর সংলগ্ন ভূখন্ড। তাতে আছে আঙ্গুরের বাগান, শষ্য ক্ষেত্র ও খর্জ্জুর। একটির মূল অপরটির সাথে মিলিত এবং কতক মিলিত নয়। এগুলোকে একই পানি দ্বারা সেচ করা হয়। আর আমি স্বাদে একটিকে অপরটির চেয়ে উৎকৃষ্টতর করে দিই। এগুলির মধ্যে নিদর্শন রয়েছে বোধশক্তি সম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য ।' [2]

হ্যাঁ, চিন্তাশীল ব্যক্তিদের জন্য এতে রয়েছে অনেক নিদর্শন। এসব ফল একই জমিতে উৎপন্ন হয়, একই পানি দ্বারা সিক্ত হয় এবং চন্দ্র- সূর্যের কিরণ ও বাতাস একই রকম পায়। কিন্তু তা সত্ত্বে ও এসবের রং ও স্বাদ বিভিন্ন এবং আকারে ছোট ও বড় । কাছাকাছি হওয়া সত্ত্বেও নানা ধরণের বিভিন্নতা এ বিষয়ের সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, একই উৎস থেকে উৎপন্ন বিচিত্র ধর্মী এসব ফল ফসলের সৃষ্টি কোন এক বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ সত্ত্বার আদেশের অধীনে চালু রয়েছে।

---

[1] সূরা ওয়াকিয়া,৬৩-৬৪।

[2] সূরা রা'দ,৪।

নিঃ সন্দেহে এতে আল্লাহর শক্তি, মাহাত্ম্য ও একত্বের বহু নিদর্শন রয়েছে।

قُلِ اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ . الرعد : ١٦

'বল, আল্লাহই প্রত্যেক বস্তুর স্রষ্টা এবং তিনি একক পরাক্রমশালী।'[1]

أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَئِلَٰهٌ مَعَ اللّٰهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. النمل : ٦٤

'বলতো কে প্রথমবার সৃষ্টি করেন, অতঃপর তাকে পুনরায় সৃষ্টি করেন এবং কে তোমাদেরকে আকাশ ও পৃথিবী থেকে রিযক দান করেন? সুতারাং আল্লাহর সাথে অন্য কোন উপাস্য আছে কি? বলুনঃ তোমরা যদি সত্যবাদী হও তাহলে তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত কর।'[2]

إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللّٰهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. العنكبوت: ١٧

'আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যাদের ইবাদত করছ তারা তোমাদের রিযকের মালিক নয়। কাজেই আল্লাহর কাছে রিযক তালাশ কর। তাঁর ইবাদত কর এবং তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। তাঁরই কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।[3]

পানি ও আল্লাহর একত্ববাদ

মহান স্রষ্টার সৃষ্টিতে 'পানি' হচ্ছে তাঁরই মহান দয়ার নিদর্শন। পানির অপর নাম জীবন। পানি ছাড়া জীবন বাঁচতে পারেনা। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. الأنبياء : ٣٠

'কাফিররা কি ভেবে দেখে না যে, আকাশের বৃষ্টি ও মাটির ফসল বন্ধ ছিল, অতঃপর আমি উভয়কে খুলে দিলাম এবং জীবন সম্পন্ন সব কিছুকে আমি পানি থেকে সৃষ্টি করলাম। তারপরও কি তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না?[4]

---

[1] সূরা রা'দ ,১৬।

[2] সূরা নামল, ৬৪।

[3] সূরা আনকাবুত, ১৭।

[4] আম্বিয়া, ৩০।

আল্লাহ্ তাআলা আরও বলেনঃ

فَانْظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَةِ اللهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا. الروم : ٥٠

'তুমি আল্লহর রহমতের চিহ্ন দেখ যে, কি ভাবে তিনি মৃত্তিকার মৃত্যুর পর তাকে জীবিত করেন।'[1]

আধুনিক বিজ্ঞান আমাদেরকে জানতে সাহায্য করে যে, কিছু কিছু ব্যাকটেরিয়া বা ক্ষুদ্র জীবানু বাতাস ছাড়াও বাঁচতে পারে, কিন্তু পানি ছাড়া কোন জীবন বাঁচতে পারে না।

বিজ্ঞানের আলোকে যদি আমরা আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি তাকাই তাহলে দেখতে পাই যে, সৃষ্টির মাঝে একটি বিশেষ ধারাবাহিকতা রয়েছে। আর এ ধারাবাহিকতা সৃষ্টিকে একটি অদৃশ্য আইনের সুকঠিন বাঁধনে শৃংখলাবদ্ধ করে রেখেছে। পৃথিবীর চার ভাগের তিন ভাগই পানি। আর এই পানির রয়েছে বিশেষ ধর্ম ও গুণাগুণ। পানিতে রয়েছে নির্ধারিত অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন। পানি সামান্য চাপ ও তাপেই গ্যাসে পরিণত হয়। সূর্যের তাপে পানি জলীয় বাস্পে পরিণত হয়ে উপরে উঠে ক্রমে ঠান্ডা বাতাসের স্পর্শ পেয়ে মেঘ ও বৃষ্টির ফোটা সৃষ্টি করে আবার পৃথিবীতে নেমে আসে। এ পানিচক্র স্রষ্টার নির্দেশে পৃথিবীতে জীবন সঞ্চার করে।

আল্লাহ্ তাআলা বলেনঃ

وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ. المؤمنون: ١٨

'আমি আকাশ হতে পরিমিতভাবে পানি বর্ষণ করি। অতঃপর আমি মৃত্তিকায় সংরক্ষণ করি।'[2]

এ পদ্ধতি আল্লাহর পদ্ধতি, তাতে সৃষ্টির কোন হাত নেই। বিজ্ঞানের অগ্রগতি ও অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতির আবিস্কারের ফলে দিনের পর দিন মহান স্রষ্টার কুদরতের বহিঃপ্রকাশ ঘটছে এবং প্রতীয়মান হচ্ছে যে, আল্লাহর সৃষ্টির যাবতীয় ও তাঁর বিধান আমাদের জ্ঞাতে ও অজ্ঞাতে কল্যাণ সাধন করে যাচ্ছে। আমরা কি কখন ও ভেবে দেখেছি কিভাবে কোন পদ্ধতিতে পানি থেকে মেঘ, আবার মেঘ থেকে বৃষ্টি হয়? আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেনঃ

---

[1] সূরা রুম,৫০।

[2] সূরা মুমিনূন, ১৮।

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ. النور: ٤٣

'তুমি কি দেখনা যে, আল্লাহ মেঘমালাকে সঞ্চালিত করেন, অতঃপর উহার খন্ডগুলোকে পারস্পারিক একত্রিত ও সম্মিলিত করেন। পরে একে আরও পুঞ্জীভূত ও ঘনীভূত করে তোলেন, তারপর তুমি দেখ যে, তার অভ্যন্তর থেকে বৃষ্টি নির্গত হয়। তিনি আকাশস্থিত শিলাস্তুপ থেকে শিলা বর্ষণ করেন। এবং তা দ্বারা যাকে ইচ্ছা আঘাত করেন এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা তা অন্য দিতে ফিরিয়ে দেন। তাঁর বিদ্যুৎ ঝলক দৃষ্টিশক্তি যেন বিলীন করে দিতে চায়।'[1]

উপরোক্ত আয়াতে আবহাওয়া বিদ্যার বিচিত্র ও কৌতুহলোদ্দীপক তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সূর্যতাপে নদী নালা বা সাগরের পানি জলীয় বাস্পে পরিণত করেন। জলীয় বাস্প বাতাসের তুলনায় হালকা বলে ওপরে উঠে যায়। উপরের ঠান্ডা বাতাসের সংস্পর্শে মেঘের সৃষ্টি হয়। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে, সাগরের সমস্ত পানিই হচ্ছে লবণাক্ত। লবণাক্ত পানিকে এই পদ্ধতিতে মহান দয়াবান স্রষ্টা বিশুদ্ধ ও মিষ্টি পানিতে রূপান্তরিত করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. سورة الفرقان: ٤٨

'আর তিনিই বায়ুকে রহমতের অগ্রদূত হিসাবে পাঠিয়ে দেন। তিনি আকাশ থেকে বিশুদ্ধ পানি পাঠিয়ে থাকেন।'[2]

কারণ তিনি ভাল ভাবেই অবগত আছেন যে, লবণাক্ত পানি স্বীয় বান্দার স্বাস্থ্য ও পরিবেশের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকারক। সাগরের পানি সূর্যের তাপে জলীয় বোস্পের মাধ্যমে লবণমুক্ত হয়ে আকাশের দিকে উঠে। এই জলীয় বাস্প উপরের দিকে উঠতেই থাকে এমন নয়। উপরে উঠে চাঁদ পানি বর্ষণ করবে তাও না? যেহেতু সেখানে পানি বর্ষণ উদ্দেশ্য নয়, বরং এর উদ্দেশ্য হলো পৃথিবীর দেশ, মহাদেশের অভ্যন্তরে আল্লাহর বান্দাদের পানি পান করানো।

---

[1] সূরা নূর , ৪৩।

[2] সূরা ফুরকান , ৪৮।

এই পানির বিশেষ প্রয়োজন পৃথিবীতে, ওখানে নয়। তাই আল্লাহ একটা নিয়ম নীতি নির্ধারণ করে রেখেছেন সৃষ্টির মাঝে। তাই উপরে উঠার একটা নির্দিষ্ট সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আর এই পদ্ধতিতেই মহান দয়াময় আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির মাঝে পানি পৌঁছে দেন যাতে তারা মহান স্রষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেনঃ

أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ﴿٦٨﴾ أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ ﴿٦٩﴾ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ ﴿٧٠﴾ سورة الواقعة

'তোমরা যে পানি পান কর, সে সম্পর্কে ভেবে দেখেছ কি? এই পানি মেঘ থেকে তোমরা কি বর্ষণ কর, না আমি বর্ষণ করি? আমি ইচ্ছা করলে তাকে লবণাক্ত করে দিতে পারি। অতঃপর তোমরা কেন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর না?'[1]

আধুনিক বিজ্ঞান সাগরের পানি উপরে উঠার প্রধান কারণ হিসাবে সূর্যের উত্তাপ ও বাতাসকে নির্ণয় করেছে। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ .

الأعراف : ٥٧

'তিনিই বৃষ্টির পূর্বে সুসংবাদবাহী বায়ু পাঠিয়ে দেন। এমন কি যখন বায়ুরাশি পানিপূর্ণ মেঘমালা বয়ে আনে তখন আমি এ মেঘমালাকে একটি মৃত শহরের দিকে হাঁকিয়ে দিই।'[2]

মিসরের কাহেরা বিশ্ববিদ্যায়ের ডঃ জারাল উদ্দীন আল আফিন্দি বর্ণনা করেন যে, মেঘগুলো স্তর ভিত্তিক নীচের দিক থেকে উপরের দিকে পনের মাইল অথবা তারচেয়ে বেশী লম্বা। দূর থেকে যদি কেউ তার প্রতি লক্ষ্য করে তাহলে দেখতে পাবে পাহাড়ের ন্যায়। আর এই পাহাড়ের চূড়া থেকেই ঠান্ডা উৎপাদন হতে থাকে। আজ থেকে ১৪০০ বছর পূর্বে পবিত্র কুরআনে এ বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ سورة النور: ٤٣

'তিনি আকাশস্থিত পাহাড়, যাতে রয়েছে শীতলতা, তা থেকে বর্ষণ করেন।'[1]

---

[1] সূরা ওয়াকিয়া, ৬৮-৭০।

[2] সূরা আরাফ , ৫৭।

আল্লাহ তাআলা আবহাওয়া ঠান্ডা করে সৃষ্টি করেছেন, যার উচ্চতা সাগরের উপর থেকে উপর দিকে প্রায় ৮ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত। জলীয় বাস্প ঠান্ডা বাতাসের সংস্পর্শে ঘন হয়ে মেঘে পরিণত হয়। ঠান্ডার কারণে এই পানি আকাশের আরও উপরে উঠা বন্ধ হয়ে যায়।

সাধারণ জ্ঞানে বলে যে, সূর্যের যতই নিকটবর্তী হওয়া যাবে উত্তাপ ততই বাড়বে, যেমনটা রয়েছে আকাশের উচ্চ স্তরগুলোতে। কিন্তু পৃথিবীর জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর বিপরীত ব্যবস্থা করেছেন। পৃথিবী থেকে উপরে আট মাইলের পর যতই উপরে উঠবে ততই তাপমাত্রা বৃদ্ধি না পেয়ে কমতে থাকে। আর এটা এ জন্যই যে, সাগর থেকে বেরিয়ে আসা পানি যাতে পৃথিবীর আবহাওয়ার মধ্যেই অবস্থান করতে পারে।

বিজ্ঞান আমাদেরকে আরও জানিয়ে দেয় যে, সাগরের পানি জলীয় বাস্প হয়ে উপরে উঠে। জলীয় বাস্প পাতলা, খালি চোখে দেখা যায় না। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ঠান্ডা বাতাস পাঠিয়ে দেন। এই জলীয় বাস্প ঠান্ডা বাতাসের স্পর্শ পেয়ে মেঘে পরিণত হয়ে একত্রিত হতে থাকে।তারপর এই মেঘ বাতাসের মাধ্যমে সাগরের উপর দিয়ে মহাদেশগুলোর অভ্যন্তরে পৌঁছে যায়।

আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ . سورة الروم: ٤٨

'তিনি আল্লাহ বায়ু প্রেরণ করেন, অতঃপর তা মেঘমালাতে সঞ্চারিত করে। তারপর তিনি মেঘমালাকে যেভাবে ইচ্ছা আকাশে ছড়িয়ে দেন এবং তাকে স্তরে স্তরে রাখেন। এরপর তুমি দেখতে পাও তার মধ্য থেকে নির্গত হয় বৃষ্টিধারা। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাদেরকে ইচ্ছা তাদের নিকট ওটা পৌঁছান, তখন তারা আনন্দিত হয়।'[২]

সেই মহান করুণাময়রে একক পদ্ধতিতে স্বীয় বান্দার কল্যাণার্থে আকাশ পথে লক্ষ লক্ষ টন পানি সরবরাহ হয়ে থাকে। আর মানুষকে এর বিনিময়ে কোন মূল্য প্রদান করতে হয় না। আমরা আল্লাহর এই দয়া করুণা ও রহমতের প্রতি কি কখনও চিন্তা করেছি? তাঁর করুণা ও দয়ার মধ্যে এটাও যে, আকাশ থেকে পানি বর্ষণ একবারে,

---

[1] সূরা নূর , ৪৩।

[2] সূরা রূম, ৪৮।

একাধারে না হয়ে ফোটা ফোটা রহমত স্বরূপ বৃষ্টি আকারে এ পৃথিবীতে নেমে আসে। আর যদি বিন্দু বিন্দু আকারে না নেমে অন্য কোন আকারে পতিত হতো তাহলে আমাদের অবস্থা, গাছপালা, তরুলতা, পশু,পাখির অবস্থা কি হতো তা কি কখনও ভেবেছি?

তারপর এই পানি আল্লাহর কুদরতে জমিনে সংরক্ষণ হচ্ছে। কুপ, নলকুপ, ডিপ টিউবওয়েলের মাধ্যমে এই সংরক্ষিত পানি দ্বারা মানুষ উপকৃত হচ্ছে। তারপরও কেন মানুষ বুঝও বুঝেনা, শুনেও শুনেনা, দেখেও দেখেনা,

আল্লাহর নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না?

আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا . سورة نوح: ١٣

'ওহে মানুষ! তোমাদের কি হলো যে, তোমরা আল্লাহর শ্রেষ্টত্ব ও মহত্ব স্বীকার করছ না?'[1]

তিনি আরও বলেনঃ

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ. سورة الملك: ٣٠

'তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি তোমাদের পানি ভূগর্ভের গভীরে চলে যায়, তাহলে কে তোমাদেরকে পানি সরবরাহ করবে?' [2]

আল্লাহর দয়ার নিদর্শন সমূহের মধ্যে এটাও একটি যে, পানি বরফ হলে হালকা হয়েকা যায়। অথচ অন্যান্য তরল পদার্থ জমাট বাধলে তা ভারী হয় ও আয়তনে কমে যায় অথচ পানি জমতে শুরু করলে তা আয়তনে বৃদ্ধি পায়, ঘনত্ব কমে যায় ও হালকা হয়, ফলে উপরে ভেসে উঠে। আমরা কি কখনও ভেবে দেখেছি, কেন এমন হয়?

সমুদ্রে অসংখ্য জীব রয়েছে। সৃষ্টিকর্তা এ সম্পর্কে সার্বিক অবগত আছেন বিধায় এই সব প্রাণীদের রক্ষার্থে পানিকে এমন গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন করেছেন যে, তাপমাত্রা যেসব অঞ্চলে শূন্যের কোঠায় সেখানে পানির বৈশিষ্ট্য এমন না হলে সেই সব অঞ্চলের সমুদ্রের প্রাণী ও উদ্ভিদগুলো চিরতরে নিঃশেষ হয়ে পড়ত।

আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا . سورة الدهر: ٢٩

---

[1] সূরা নুহ ১৩।

[2] সূরা মুলূক, ৩০।

'এ হচ্ছে এক উপদেশ, অতএব যার ইচ্ছা সে তার পালনকর্তার রাস্তা অবলম্বন করুক।'[1]

বাতাস ও আল্লাহর একত্ববাদ

মানব জীবনে বাতাসের গুরুত্ব ছোট করে দেখার কোন অবকাশ নেই। এটা যে মহান স্রষ্টার কত বড় কৃপা তা ঐ সময় অতি সহজেই উপলদ্ধি করা সম্ভব হবে যদি এক মিনিট অথবা দুই মিনিট নাক ও মুখ বন্ধ করে রাখা হয় । বাতাসে রয়েছে অক্সিজেন যার প্রয়োজন আমাদের সব সময়। যদি কোন কারণ বশতঃ পৃথিবী থেকে বাতাস বিদায় নিতো তাহলে কয়েক মিনিটের মধ্যেই সমস্ত মানুষ ঘুমিয়ে পড়ত চিরন্তন মৃত্যু শয্যায়। মহান স্রষ্টার সৃষ্টিতে আমাদের জন্য কত যে কল্যাণ রয়েছে তা কি আমরা কখনও ভেবে দেখেছি? আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللهَّ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللهَّ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ . سورة لقمان: ٢٠

'তোমরা কি দেখনা যে, আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্তই আল্লাহ তোমাদের কল্যাণের জন্য নিয়োজিত করেছেন এবং তোমাদের প্রতি তাঁর প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করেছেন? মানুষের মধ্যে কেউ কেউ জ্ঞান ছাড়াই আল্লাহ সম্পর্কে বিতন্ডা করে। তাদের না আছে পথ নির্দেশক না আছে কোন জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ।' [2]

বিজ্ঞান আমাদরেকে জানিয়ে দেয়, মানুষ শ্বাস প্রশ্বাসের মাধ্যমে বিশুদ্ধ বাতাস থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড পরিত্যাগ করে। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষের এই পদ্ধতি চালু আছে। বাতাসে অক্সিজেন যদি কমে যেতো তাহলে অল্প সময়ের মধ্যে মানুষ ধ্বংসের সম্মুখীন হতো। আজীবন মানুষ অক্সিজেন গ্রহণ করছে, আর কার্বন ডাই অক্সাইড পরিত্যাগ করছে। তারপরও কেন অক্সিজেন কমে না? অক্সিজেন না কমার কারণ সমস্ত জাহানের প্রতিপালক যিনি তিনি অত্যন্ত দয়ালু, তাঁর বিস্ময়কর কৃপায় জীবন বাঁচিয়ে রাখার জন্য সৃষ্টি করেছেন গাছপালা, তরুলতা, যারা এই কার্বনডাই অক্সাইড গ্রহণ করে ফিরিয়ে দেয় অক্সিজেন। আর এভাবে পরিবেশে বিরাট সমন্বয় সাধিত হয়ে প্রাণী জগত বেঁচে থাকে এই পৃথিবীতে। সেই মহান সৃষ্টিকর্তা মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার প্রয়োজনীয় সব কিছুর

---

[1] সূরা দাহর, ২৯।
[2] সূরা লোকমান, ২০।

ব্যবস্থা করেছেন। মানুষ যখন তার মায়ের পেটে, সেখানেই সৃষ্টি করেছেন এমন সূক্ষ্ম যন্ত্র(ফুসফুস) যা জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বিরতিহীন ভাবে তিনি পৃথিবীর সব জায়গায় এই বাতাসের ব্যবস্থা করে রেখেছেন যা পেতে আমাদরেকে কখনও কষ্ট করতে হয় না, পরিশ্রম করতে হয় না। তা পেতে কাজ করে যাচ্ছে। আমরা ঘুমাই, কিন্তু তার কাজ চলতেই থাকে। অপর দিকে, আমরা ক্লান্ত বোধ করি না। শেষ হওয়ার ভয় নেই, গুদাম ভান্ডারে জমা করে রাখার প্রয়োজন নেই। অনেক সময় বাতাসের বেগ প্রবল ও দ্রুত হতে দেখা যায়। এমনকি কোন কোন সময় ঘরবাড়ী নষ্ট হয়। এই বাতাসের কারণেই গাছপালা ধ্বংস হয়, পশু-পাখি, জীব-জন্তু মারা যায় এবং ধন সম্পদের ব্যাপক ক্ষয় ক্ষতি হয়। তবে প্রশ্ন জাগে, কেন বাতাসের এই গতিবেগ? পরিবেশ বিজ্ঞানীরা বলেন, মাঝে মাঝে বাতাস যদি বেগবান না হতো তাহলে বিস্তৃত সাগর ও বিশাল মরুভূমিতে যে সকল প্রাণী বসবাস করে তারা অক্সিজেনের অভাবে মহাবিপদের সম্মুখীন হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পরত। কারণ সেখানে পরিবেশ ভারসাম্য রক্ষার জন্য অক্সিজেন সরবরাহ করার মত কোন গাছপালা নেই। মহান স্রষ্টা, সার্বিক জ্ঞাত, করুণাময় আল্লাহ তাআলা বাতাসের বেগ সৃষ্টি করে সবার অজান্তে সেই সব প্রাণীর জীবন রক্ষা করে যাচ্ছেন।

বিজ্ঞানীগণ আরও বর্ণনা করেন যে, বাতাসের গতিবেগ যদি দ্রুত না হতো তাহলে পরাগায়নের অভাবে গাছে ফল হতনা। এমনিভাবে বাতাসকে দ্রুত সঞ্চালনের মধ্যে মানব জাতির অশেষ কল্যাণ সাধিত হচ্ছে। অতএব বাতাসের বেগ ও দ্রুততার কারণে যতটুকু ক্ষতি হয় তারচেয়ে অনেক গুণ বেশী কল্যাণ সাধিত হয়। এই বায়ুমন্ডল আল্লাহর অফরন্ত নেয়ামত। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللهِّٰ لَا تُحْصُوهَا . سورة إبراهيم : ٣٤

‘যদি আল্লাহর নেয়ামত গণনা কর তাহলে তা গুণে শেষ করতে পারবে না।’[1]

প্রতিদিন পৃথিবীকে আঘাত হানার জন্য মহাশূন্য থেকে লক্ষ লক্ষ উল্কা ছুটে আসা ধ্বংসাত্বক উল্কাগুলোকে প্রতিহত করার মাঝেই রয়ে গেছে জীবন রক্ষার সকল রহস্য। মহান আল্লাহ কত সুনিপুণ স্রষ্টা! আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

إِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآَيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَابَّةٍ آَيَاتٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿٤﴾ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنْزَلَ اللهُّٰ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ

[1] সূরা ইবরাহীম,৩৪।

الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ آَيَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٥﴾ تِلْكَ آَيَاتُ اللهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللهِ وَآَيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ ﴿٦﴾ الجاثية

'নিশ্চয়ই নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে মুমিনদের জন্য নিদের্শনাবলী রয়েছে। আর তোমাদের সৃষ্টিতে এবং চারিদিকে ছড়িয়ে রাখা জীব জন্তুর সৃজনের মধ্যেও নিদর্শনাবলী রয়েছে বিশ্ববাসীর জন্য। দিবা রাত্রির পরিবর্তনে, আল্লাহ আকাশ থেকে যে রিযিক (বৃষ্টি) বর্ষণ করেন, অতঃপর পৃথিবীকে তার মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত করেন তাতে এবং বায়ুর পরিবর্তনে বুদ্ধিমানদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে। এগুলো আল্লাহর আয়াত যা আপনার কাছে বর্ণনা করি যথাযথ রূপে। অতএব, আল্লাহর আয়াতের পর তারা কোন কথায় বিশ্বাস স্থাপন করবে? [1]

আবহাওয়া বার্তা ইলমুল গায়েব নয়

মহান করুণাময় আল্লাহর অশেষ নেয়ামত সর্বদা আমাদের উপর বর্ষিত হচ্ছে। সেই নেয়ামতের মধ্যে 'বৃষ্টি' অন্যতম। বৃষ্টি বর্ষণের মাধ্যমে যমীনকে জীবিত করা হয়, গাছপালা সজীব হয়, শস্য উৎপাদন হয়, জীব জন্তু বেঁচে থাকে। বৃষ্টির আগমন সম্পূর্ণ আল্লাহর ইচ্ছাধীন। সৃষ্টির নিজের কিংবা অন্য কারও কোন নিয়ন্ত্রণ সেখানে নেই। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

إِنَّ اللهَّ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللهَّ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. لقمان : ٣٤

'নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছেই কেয়ামাতের জ্ঞান রয়েছে। তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং গর্ভাশয়ে যা থাকে তিনি তা জানেন কেউ জানে না আগামীকাল সে কি উপার্জন করবে এবং কেউ জানে না কোন দেশে সে মৃত্যু বরণ করবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্ব বিষয়ে সম্যক জ্ঞাত।'[2]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করেছেঃ

ولا يعلم أحد متى يأتي المطر إلا الله (رواه أحمد)

---

[1] সূরা জাসিয়া, ৩-৬।

[2] সূরা নোকমান, ৩৪।

'আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না যে, কখন বৃষ্টি আসবে।'[1]

বহুকাল পূর্ব থেকেই প্রকৃতির গবেষণা চলছে। আজ কৃত্রিম উপগ্রহের যুগেও চলছে। আবহাওয়া পূর্বাভাসের জন্য রাডার আবিস্কার হয়েছে, কিন্তু তারপরও বৃষ্টির সঠিক ও নির্ভূল খবর দেয়া মানুষের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না।

বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে আবহাওয়া দফতর থেকে রেডিও, টেলিভিশনের মাধ্যমে পরিবেশিত আবহাওয়া বার্তা কি ইলমুল গায়েবের শামিল? তারা আধুনিক যন্ত্রপাতি দিয়ে বৃষ্টির বিভিন্ন আলামতের মাধ্যমে কিছুটা পূর্বাভাস দিতে পারে। তাও কিন্তু এটা বলতে পারে না যে, আগামীকাল কোন এক নির্দিষ্ট স্থানে বৃষ্টি হবে অথবা হবে না। কিন্তু আবহাওয়া বার্তা আবিস্কারের শুরুতে মানুষরা বলছিলঃ আগামীকাল অমূক শহরে এতটার সময় বৃষ্টি হবে। হঠাৎ করে দেখা যায়, সেখানে বৃষ্টি নেই। আবার বলতো, আগামীকাল আবহাওয়া শুস্ক থাকবে, কিন্তু দেখা যায় তার উল্টা।

বেশ কিছু দিন পূর্বে আমেরিকার এক কোম্পানি গঠন করা হয়েছিল যারা বৃষ্টি বিক্রি করত। তবে তারা এক ব্যক্তি অথবা মত্র একটি শহরের জন্য বৃষ্টি বিক্রি করত না, বরং তারা কয়েকটি শহরকে কেন্দ্র করে এক সাথে বৃষ্টি বিক্রির ব্যবস্থা করতো। তবে নিয়ম হলো, তাদেরকে বৃষ্টির সার্বিক মূল্য অগ্রীম প্রদান করতে হতো। তারা বলতোঃ আমরা আমাদের বিমান ও যন্ত্রপাতি নিয়ে আকাশে উঠব, উক্ত শহরগুলোর মধ্যে যে কোন শহরে যদি বৃষ্টি হয় তাহলে আমাদের দায়িত্ব শেষ। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, তারা তাদের বিমান ওয়াশিংটন শহরে উড়ালো, কিন্তু দেখা গেল যে, সেই শহরে বৃষ্টি না হয়ে নিউইয়র্ক শহরে বৃষ্টি হল। তারপর তারা বলে, দেখ আমরা বৃষ্টি বর্ষণ করেছি। বৃষ্টির প্রয়োজন ছিল এক শহরে, আর বৃষ্টি হলো অন্য শহরে। আমেরিকার সেই কোম্পানির বিরুদ্ধে কোর্টে মামলা হলো। কোর্ট ঐ কোম্পানির বিরুদ্ধে রায় দিলো যে, তাদের বৃষ্টি বর্ষণের দাবী মিথ্যা ও মূর্খতার শামিল। ঐ দাবীর কোন অস্তিত্ব নেইএবং নির্ভরযোগ্য নয়।

আব্দুল মাজীদ ঝান্দানী এক আরব দেশের ঘটনা বর্ণনা করেছেন।[2] সেই দেশে বৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে বৃষ্টি বর্ষণ করার জন্য কোম্পানিকে ডেকে নিয়ে এসেছিল। সেই কোম্পানীর বৃষ্টির মূল্যের এক তৃতীয়াংশ অগ্রীম দাবী করলো। তারা তাদের কার্যক্রম শুরু করলো। পরিশেষে তারা বললোঃ আমরা দুঃখিত, আপনাদের দেশে বৃষ্টি বর্ষণ করা সম্ভব নয়। কারণ আপনাদের দেশের আবহাওয়া শুস্ক, মেঘ তৈরী হচ্ছে না, অতএব এ আবহাওয়ায় বৃষ্টি বর্ষণ করানো অসম্ভব। এ বলে তারা

---

[1] আহমাদ, ২/২৪,৫২।

[2] আয়াতুল্লাহি ফিল আফাক,২৭পৃষ্ঠা।

তাদের অগ্রিম ফেরত না দিয়েই বিদায় নিলো। তবে মজার ব্যাপার হলো ঃ তাদের বিদায়ের প্রায় দুই সপ্তাহ পর সেখানে মুষলধারে বৃষ্টি হয়েছিল। সুবহানাকা ইয়ারব!

আল্লাহর কোন শরীক নেই

মানুষের বর্তমান দেহাবয়ব ও তার দৈহিক গঠন এক জীবন্ত ও অতি উচ্চ মানের পরিকল্পনাকারী স্রষ্টার অকাট্য ও অনস্বীকার্য স্বাক্ষী। মানব সৃষ্টি ও সুবিশাল বিশ্ব পরিচালনায় এসব পরিকল্পনা, সুন্দরও সঠিক নিয়ম শৃংখলায় নির্ভূলতা ও অসামঞ্জস্যপূর্ণতা সুস্পষ্ট ভাবে আরও প্রমাণ করে যে, মহান স্রষ্টা এক ও অদ্বিতীয়,তার কোন শরীক নেই।

এক সময় তুমি নিজে একটি গর্ভস্থ ডিম্ব ছিলে মাত্র। ছিলে অতি ক্ষুদ্রতর একটি কোষ। সেই সহজ সূচনা মুহূর্ত থেকে চরম জটিল উন্নয়নের মাধ্যমে তোমার দেহ গড়ে উঠেছে। শেষ পর্যন্ত চিন্তা ক্ষমতা সম্পন্ন মগজ, দৃষ্টিমান চোখ, শোনার কান, এমনিভাবে অন্যান্য বহু গুরুত্বপূর্ণ ও একান্ত প্রয়োজনীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গড়ে উঠেছে। এখানেই শেষ নয়, মানুষ তার অস্তিত্বকে মুহূর্তে বাঁচিয়ে রাখার জন্য বাতাস, পানি, খাদ্য, আলো বা তাপ প্রভৃতি নৈসর্গিক ও বাহ্যিক উপাদান উপকরণের মুখাপেক্ষী। এর কোন একটি ছাড়া এক বিন্দু সময়ের জন্য ও বেঁচে থাকা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। বৈচিত্রময় পৃথিবী ও মানব দেহ সৃষ্টি ও উন্নয়নের এই জটিলতর পদ্ধতি একজন অতিশয় বুদ্ধিমান বিচক্ষণ সৃষ্টিকর্তা এবং একজন একক সংগঠকের অস্তিত্ব প্রমাণ করে।[1]

বর্তমান বিশ্বের চিকিৎসকগণ বর্ণনা করছেন যে, আমাদের খাদ্য পাকস্থলীর কাজের উপর নির্ভশীল। পাকস্থলীর কার্যক্রম রক্তের কার্যক্রমের উপর নির্ভরশীল। রক্তের কার্যক্রম বাতাসও ফুসফুসের সাথে সংশ্লিষ্ট। শ্বাস প্রশ্বাসের উপযোগী বাতাস গাছপালার উপর নির্ভরশীল। গাছপালা সূর্যের উপর নির্ভরশীল। সূর্যের উপস্থিতি আবার গ্রহ নক্ষত্রের উপস্থিতির উপর নির্ভশীল। এমনি ভাবে আমরা দেখতে পাই যে, এক বস্তু অপর বস্তুর উপর নির্ভরশীল। অতএব এর সব কিছুই এটাই প্রমাণ করে যে, এগুলো প্রতিটিই এক প্রতিপালকের সৃষ্টি। আল্লাহ্ তাআলা বলেনঃ

مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ. سورة المؤمنون : ٩١

[1] বিবর্তনবাদ ও সৃষ্টিতত্ত্ব, পৃষ্ঠা১৩৫।

'আল্লাহ কোন সন্তান গ্রহণ করেননি এবং তাঁর সাথে অন্য কোন মাবুদ নেই। থাকলে প্রত্যেক মাবুদ নিজ নিজ সৃষ্টি নিয়ে চলে যেত এবং একজন অন্যজনের উপর প্রবল হয়ে যেত। তারা যা বলে, তা থেকে আল্লাহ পবিত্র। [1]

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আরও বলেনঃ

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴿١﴾ اللَّهُ الصَّمَدُ ﴿٢﴾ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ﴿٣﴾

'বলুনঃ তিনি আল্লাহ একক, আল্লাহ অমুখাপেক্ষী, তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাকে জন্ম দেয়নি। [2]

আল্লাহ ছাড়া যদি অন্য কোন মাবুদ থাকত তাহলে এই সৃষ্টি জগত পরিচালনায় ঝগড়ার সৃষ্টি হতো। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ . سورة الأنبياء : ٢٢

'যদি নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে আল্লাহ ব্যতীত অন্যান্য উপাস্য থাকত তাহলে উভয়ে ধ্বংস হয়ে যেত। অতএব তারা যা বলো তা থেকে আরশের অধিপতি আল্লাহ পবিত্র। [3]

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আরো বলেনঃ

قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا . سورة الإسراء: ٤٢

'বলুনঃ তাদের কথা মত যদি তাঁর সাথে অন্যান্য উপাস্য থাকত তাহলে তারা আরশের মালিক পর্যন্ত পৌঁছার পথ অন্বেষণ করত।' [4]

মানুষ কেন সৃষ্টি করা হয়েছে?

সমস্ত বিশ্বের ডাক্তারগণকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় যে, মানুষের চক্ষুকে কি কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে, তারা সকলেই এক বাক্যে উত্তর দিবেন, হ্যাঁ। এমনি ভাবে মুখ, কান, নাক, হাত, পা, হৃদপিন্ড,ফুসফুস, এমনকি শিরা উপশিরা সর্ম্পকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় যে, এগুলো প্রত্যেকটি সৃষ্টির কি কোন রহস্য রয়েছে তাহলে তারা অবশ্যই উত্তর দিবেন হ্যাঁ। যদি তাদেরকে সেগুলির বিস্তারিত বর্ণনা

---

[1] সূরা মুমিনূন , ৯১।

[2] সূরা ইখলাস, ১-৩।

[3] সূরা আম্বিয়া ২২।

[4] সূরা ইসরা, ৪২।

করতে বলা হয় তাহলে তারা বলবেনঃ মানুষের শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পুংখানু পুংখ রূপে জ্ঞান অর্জন করতে অনেক বছর লেগে যাবে।

সাধারণ দৃষ্টিতে আমরা লক্ষ্য করে থাকি যে, মুখ দিয়ে সমস্ত শরীরের জন্য খাওয়ার কাজ সম্পন্ন হচ্ছে। নাক দিয়ে ঘ্রাণ গ্রহণের কাজ সুসম্পন্ন হচ্ছে। পা দিয়ে হাটার কাজ হচ্ছে। এমনিভাবে প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ একটা না একটা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। অর্থাৎ প্রত্যেক অঙ্গের সৃষ্টির একটি উদ্দেশ্য রয়েছে। যদি প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সৃষ্টির উদ্দেশ্য থেকে থাকে তাহলে প্রশ্ন জাগতে পারেনা কি যে, মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য কি? সমস্ত মানব জাতিকে কেন সৃষ্টি করা হয়েছে?

বড়ই পরিতাপের বিষয়, আজ যদি বিশ্ববাসীকে এই প্রশ্ন করা হয় যে, মানুষকে কি জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে তাহলে তারা বলবেঃ আমরা জানি না।

আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿١١٥﴾ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ﴿١١٦﴾ . المؤمنون

'তোমরা কি ধারণা কর যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার কাছে ফিরে আসবে না? অতএব শীর্ষ মহিমাময় আল্লাহ, তিনি সত্যিকার মালিক, তিনি ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। তিনি সম্মানিত আরশের মালিক।'[1]

এজন্য বর্তমান মানব জাতি বড়ই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। তারা জানে না যে, তাদেরকে কেন ও কোন উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাদের জীবন শেষ হয়ে যাচ্ছে। তারা জানে না যে, তারা কেন বেঁচে আছে। কেন মৃত্যু বরণ করছে, কোথায় চলছে? তাদের অবস্থা ঐ জাহাজের ন্যায় যেখানে আরোহনের জন্য আহবান করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে হে মানুষেরা! তোমাদের জন্য এই জাহাজের বসবাসের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা আছে। এমনকি প্রয়োজনাতিরিক্ত আসবাব পত্রেরও অভাব নেই। সেখানে তোমাদের নফর, চাকর এবং শান শাওকাতের যাবতীয় সাজ-সরাঞ্জাম বিদ্যমান। এই জাহাজে তোমাদের জন্য সুষম আলো বাতাসের ব্যবস্থা রয়েছে, মনোরম দৃশ্য রয়েছে, পরিস্কার পরিচ্ছন্নতাসহ সুন্দর স্বাস্থ্যকর পরিবেশ রয়েছে। সেখানে আরও রয়েছে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বাসস্থান, নরম বিছানা, উন্নত খাট, আরাম আয়েশ ও ভোগ বিলাসের যাবতীয় সামগ্রী। সেই জাহাজে আরোহনের উৎসাহ প্রদান করে আরো বলা হচ্ছে, তোমাদের আনন্দ উপভোগের জন্য টেলিভিশন, ভিসিআর, রং তামাশা, গান বাজনা, নৃত্যের ব্যবস্থা রয়েছে। প্রশস্ত জায়গা, চাকচিক্যময় চোখ

---

[1] সূরা মুমিনূন ১১৫-১১৬।

ধাঁধাঁনো রং বেরংয়ের আলোর ব্যবস্থা রয়েছে। পানাহার, পোশাক পরিচ্ছদের অভাব নেই। খেলাধুলাসহ চিত্ত বিনোদনের সব ধরনের ব্যবস্থা রয়েছে। চিন্তা নেই, ভাবনা নেই, নেই তাতে কোন ধরনের অভাব।

এমন জাহাজে যারা আরোহন করেছে এবং যারা আরোহন করার আহবান জানাচ্ছে তাদেরকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় যে, এই জাহাজের গন্তব্য স্থান কোথায়, তোমরা কোথায় যাওয়ার জন্য ডাকছ তাহলে তারা জবাব দিবে, 'আমরা জানি না'। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেনঃ

وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ . سورة محمد : ١٢

'যারা কাফির তারা ভোগ বিলাসে মত্ত থাকে এবং তারা আহার করে যেমন চতুস্পদ জন্তু আহার করে, তাদের বাসস্থান জাহান্নাম।' [1]

এ দুনিয়ার কোন কিছুই আল্লাহ বিনা উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেননি। যে প্রাণীগুলো বোঝা বহন করে তাদেরকে সেই প্রকৃতিই দান করা হয়েছে। লাঙ্গল টানার পশুগুলোর আকার ও প্রকৃতি সেই কাজের উপযোগী করেই সৃষ্টি করা হয়েছে। সুতরাং সৃষ্টির পেছনে স্রষ্টার মহৎ চিন্তা যে কাজ করেছে এতে কোন সন্দেহ নেই। প্রাণীর আকার ও গঠন যদি নিজের পছন্দ মত গঠিত হতো তাহলে ঘোড়া নিজের ইচ্ছায় বোঝা বহন করার মত কাজ পছন্দ করতোনা। তাই প্রতিটি সৃষ্টিকে বিবেক-বুদ্ধি দিয়ে বিশ্লেষণ করলে বুঝা যায়, কোন সৃষ্টিই একজন মহাপরিকল্পকের মহৎ উদ্দেশ্য ব্যতীত সৃষ্টি হয়নি।[2] আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ ﴿٣٨﴾ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٩﴾ سورة الدخان

'আমি সভোমন্ডল, ভূমন্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সব কিছু ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করিনি। আমি এগুলো যথাযথ উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছি। কিন্তু তাদের অধিকাংশই বোঝে না। [3]

আমাদের সামনে একটি মূল্যবান ইলেক্ট্রনিক যন্ত্র আছে। এই যন্ত্রটি সম্পর্কে আমরা জানতে চাই। আমরা যদি জানতে না পারি যে, এটি কোন কাজে ব্যবহার হয় এবং কোন্ উদ্দেশ্যে এটি তৈরী করা হয়েছে তাহলে তা জানতে পারার পথ একটিই। তা হচ্ছে, যিনি এই যন্ত্রটি বানিয়েছেন তার সাথে যোগাযোগ করা। কেননা যিনি এটি

---

[1] সুরা মুহাম্মদ, ১২।

[2] সৃষ্টি ও স্রষ্টার রহস্য ,৩৩৭।

[3] সূরা দুখান, ৩৮-৩৯।

তৈরী করেছেন তিনি অবশ্যই একটি না একটি কাজের জন্যই তৈরী করেছেন। আমাদের সেটি অজানা। অতএব তার সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে ওটি তৈরীর উদ্দেশ্য জেনে নিতে হবে।

আল্লাহ তাআলা মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন। কি উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন তা তাঁর কাছ থেকে জেনে নেয়া ছাড়া কোনক্রমে জানা যাবে না। যারা গবেষণা করেছে, চিন্তা ভাবনা করেছে যে, আল্লাহর সৃষ্টির রহস্য কি তারা এর সঠিক উত্তর খুজে পায়নি, যেহেতু তারা স্রষ্টার সাথে যোগাযোগ করেনি।

মানব জাতির সৃষ্টির উদ্দেশ্য একটিই যেহেতু চোখের সৃষ্টি রহস্যও একটি। তা হচ্ছে দর্শন করা। আমি যেমনভাবে দেখছি তেমনি তুমিও দেখছো, ধনী হোক গরীব হোক, রাজা হোক প্রজা হোক, মূর্খ হোক জ্ঞানী হোক, আমাদের দেশে হোক অথবা অন্য কোন দেশে হোক, বর্তমান যুগে হোক অথবা অন্য কোন যুগে হোক, দুনিয়া সৃষ্টি হতে আজ পর্যন্ত প্রত্যেকের চক্ষু দিয়ে একই কাজ সম্পন্ন হচ্ছে। এমনিভাবে মানুষের অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলোর সৃষ্টির একই উদ্দেশ্য। স্থান কাল পাত্রের পরিবর্তনে এগুলোর উদ্দেশ্যের পরিবর্তন হয় না। অতএব মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য একই যা কখনও স্থান অথবা কালের সাথে সম্পৃক্ত নয়, সম্পদ অথবা দারিদ্রতার সাথে সম্পৃক্ত নয়, জ্ঞান অথবা অজ্ঞতার সাথে সম্পৃক্ত নয়। এই উদ্দেশ্যের সম্পর্ক হচ্ছে মানুষ সৃষ্টি ও তার প্রকৃতি বা ফিতরাতের সাথে। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

فِطْرَةَ اللهِّ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِّ . سورةالروم : ٣٠

'এটাই আল্লাহর প্রকৃতি যার উপর তিনি মানব সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই। [1]

মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য একটিই

মানব সৃষ্টির রহস্য সম্পর্কে মহান স্রষ্টা বলেনঃ

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ . سورة الذاريات: ٥٦

'একমাত্র আমার ইবাদত করার জন্য আমি মনব ও জিন জাতিকে সৃষ্টি করেছি।'[২]

তিনি আরো বলেনঃ

---

[1] সূরা রূম,৩০।

[2] সূরা যারিয়াত,৫৬।

ذَلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ . سورة الأنعام: ١٠٢

‘তিনিই আল্লাহ তোমাদের পালনকর্তা, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনিই সব কিছুর স্রষ্টা। অতএব তোমরা তাঁরই ইবাদত কর। তিনি প্রত্যেক বস্তুর কার্যনির্বাহী।’ [1]

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ . البقرة : ٢١

‘হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ইবাদত কর, যিনি তোমাদের এবং তোমাদের পরবর্তীদেরকে সৃষ্টি করেছেন। আশা করা যায়, তোমরা পরহেযগারী অর্জন করতে পারবে।[2]

মহান আল্লাহ তাআলা তাঁর কিতাবসমূহের সমাপ্তি ঘটিয়েছেন আল কুরআনকে দিয়ে। রেসালাতের সমাপ্তি ঘটিয়েছেন ইসলামকে দিয়ে। এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে একটিই। তাহচ্ছে আল্লাহর ইবাদত করা। আর এটাই ছিল সমস্ত নবী রাসূলগণের দাওয়াত। আল্লাহ তাআলা মহানবীকে উদ্দেশ্য করে বলেনঃ।

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ . سورة الأنبياء: ٢٥

‘তোমার পূর্বে এমন কোন রাসূল পাঠাইনি, বরং প্রত্যেকের কাছে অহী প্রেরণ করা হয়েছে যে, আমি ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই, অবএব আমারই ইবাদত কর।’[3]

ইবাদত কবুল হওয়ার শর্ত

মানব জাতিকে একমাত্র আল্লাহর ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। তবে ইবাদত কাকে বলে এটা আমাদেরকে ভাল করে বুঝতে হবে। আল্লাহ তাআলা যা পছন্দ করেন এবং যাতে সন্তুষ্ট থাকেন সেগুলোর সমষ্টি হচ্ছে ইবাদত। অতএব প্রতিটি হুকুম যা আল্লাহ আমাদেরকে করতে আদেশ করেছেন তা পালন করা এবং যা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন তা থেকে বিরত থাকার নাম হচ্ছে ইবাদত। ইবাদত কবুল হওয়ার শর্ত দু‘টিঃ

(১) আল ইখলাস লিল্লাহ অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহর জন্য ইবাদত করাঃ এর মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা অর্থাৎ সকল প্রকার ইবাদত

[1] সূরা আনআম, ১০২।

[2] সূরা বাকারা, ২১।

[3] সূরা আম্বিয়া, ২৫।

একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ইসলামের দিক নির্দেশনা অনুযায়ী সম্পূর্ণ করা। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ . سورة البينة: ٥

'তারা খাঁটি মনে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে, এ ছাড়া তাদেরকে কোন নির্দেশ করা হয়নি।'[1]

(২) ইত্তেবাউর রাসূল অর্থাৎ আল্লাহর ইবাদত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পদ্ধতিতে হতে হবে। অন্য কোন পদ্ধতি হলে তা গৃহীত হবে না। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ . سورة آل عمران :٣١

'বলঃ যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস তাহলে আমাকে অনুসরণ কর, তাহলেই আল্লাহও তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমদের পাপ মার্জনা করে দিবেন। '[2]

ইবাদত কি ও কত প্রকার?

মহান আল্লাহ বিশ্ব জগতের একমাত্র স্রষ্টা প্রতিপালক, রিযকদাতা, নিয়ন্ত্রণকারী ও মাবুদ মানুষকে সেহেতু একমাত্র তাঁর ইবাদত করার জন্যই সৃষ্টি করেছেন। আর ইবাদতের সঠিক পরিচয় তুলে ধরার জন্য যুগে যুগে পাঠিয়েছেন নবী, রাসূল, ও ঐশী গ্রন্থসমূহ ; যাতে বান্দারা আল্লাহর ইবাদতে তাঁর সাথে অন্য কাউকে শরীক না করে।

অতএব আমাদেরকে সঠিক ভাবে জেনে নিতে হবে 'ইবাদত' অর্থ কি, যাতে করে আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহর ইবাদতক প্রতিষ্ঠিত করতে পারি। "ইবাদত" এর আভিধানিক অর্থ হলো অবনমিত হয়ে অনুসরণ করা এবং নিজকে তুচ্ছ মনে করে দাসে পরিণত করা ইত্যাদি।

ইসলামের পরিভাষায়ঃ

العبادة : هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة.

'ইবাদত হলো প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য ঐ সকল কথা ও কাজের সমষ্টি যেগুলো আল্লাহ পছন্দ করেন এবং রাযী খুশী ও সন্তুষ্ট থাকেন। [3]

[1] সূরা বাইয়িনাহ, ৫।

[2] সূরা আলে ইমরান, ৩১।

[3] العبادة في الإسلام

এই সংজ্ঞাটিতে নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাতসহ মানব জীবনের ব্যক্তিগত ওসমষ্টিগত জীবন থেকে শুরু করে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবন তথা গোটা জীবনের সকল কার্যাবলী ইবাদতের মধ্যে শামিল হয়েছে। যে ব্যক্তি আল্লাহর ইবাদতে অন্যকে শরীক করে তাকে মুশরিক বলা হয়। আর যে আল্লাহর ইবাদত করে, কিন্তু শরীয়তের নির্দেশিত পন্থায় করে না তাকে বেদআতী বলা হয়। আর যে ব্যক্তি শরীয়তে নির্দেশিত পন্থায় একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করে তাকেই বলা হয় মুমিন। আধুনিক যুগে ইবাদতের সঠিক সংজ্ঞা না বুঝার কারণে অনেক লোক মনে করে নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত, কুরবানী, ও কুরআন তেলাওয়াত ইত্যাদি হলো ইবাদত। তাদের মতে মানব জীবনের সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক কর্মকান্ডের সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই। তারা মনে করে ইবাদত নিতান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার। আর তাও কয়েকটি আনুষ্ঠানিক ইবাদতের মধ্যে সীমাবদ্ধ। ফলে দেখা যায় যে, একজন মুসলিম নামাজ রোজা আদায় করে, অথচ ব্যাংকের সুদের লেনদেন করে। নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশাকে উৎসাহ প্রদান করে, সংস্কৃতির নামে উলঙ্গপনাকে উদ্বুদ্ধ করে। আল্লাহর হুকুম আহকাম ও বিধি-বিধানকে পরিত্যাগ করে নিজে আইন রচনা করে। আল্লাহ কর্তৃক নিষিদ্ধ বস্তুকে নিজের আইন দিয়ে জায়েয করে নেয়।

ইবাদতের প্রকারভেদ

মহান করুণাময় আল্লাহ তাআলা মানব জাতিকে একমাত্র তাঁরই ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর নবী রাসূল ও আসমানী কিতাব সমূহের মাধ্যমে বার বার সতর্ক করে দিয়েছেন যাতে কেই তাঁর ইবাদতে অন্য কাউকে শরীক না করে। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, মুসলিমদের মধ্যে অনেকেই শিরক ও আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদতকে একটি ধারায় সীমাবদ্ধ করেছে। আর তাহচ্ছে মাটি অথবা পাথর দিয়ে নির্মিত মূর্তির পূজা করা। তারা ধারণা করে যে, একমাত্র এটাই হচ্ছে শিরক। তাই তারা বলে থাকে যে, আমরা তো আর পাথর গাছ ও মূর্তির ইবাদত করি না।
যদি এমনটাই হতো তাহলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেননা যে,

الشرك في أمتي أخفى من دبيب النمل على الصفا (رواه أحمد)

‘আমার উম্মাতের মাঝে শিরক এমন গোপন ভাবে থাকবে যা সাফা পাহাড়ের উপর বিচরণকারী পিপীলিকার পায়ের শব্দের চেয়ে সূক্ষ্ম।

আসলে তাদের অজ্ঞতার কারণেই এমন ধারণা করে থাকে । ব্যাপারটি স্পষ্ট হওয়ার জন্য আমরা তাহলে ইবাদতের প্রকারভেদ সম্পর্কে আলোচনা করি। ইবাদত সাধারণতঃ দুই প্রকার ।

(১) আল্লাহর ইবাদত

আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

وَاعْبُدُوا اللهَّ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا . سورة النساء: ٣٦

'তোমরা একমাত্র আল্লাহরই ইবাদত কর এবং তাঁর সাথে কেন শরীক করনা ।'[1]

(২) আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদতঃ যেমন শয়তানের ইবাদত, মূর্তি পূজা করা ইত্যাদি । আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آَدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ . سورة يس: ٦٠

'হে আদম সন্তানেরা! আমি কি তোমাদের কাছ থেকে এ অঙ্গীকার নেইনি যে, তোমরা শয়তানের ইবাদত করবে না ।'[2]

আল্লাহর ইবাদত চার ভাবে হয়ে থাকেঃ

(ক) বিশ্বাসগত বা আত্মিক ইবাদতঃ যে সকল ইবাদতের সম্পর্ক আত্মা ও বিশ্বাসের সাথে জড়িত। যেমন আল্লাহর রুবুবিয়াতের বিশ্বাস তার উত্তম নামসমূহ ও গুণাবলীতে বিশ্বাস, মাবুদ হিসাবে আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস। তাঁর কাছে আশা পোষণ করা, অন্তর দিয়ে তাকে ভালবাসা, একমাত্র তাঁকেই ভয় করা, তাঁরই উপর ভরসা করা, তাঁরই ফয়সালায় সন্তুষ্ট থাকা, তাঁরই কাছে বিপদে আশ্রয় প্রার্থনা করা, এবং তাঁরই প্রদত্ত বিধি বিধান সন্তুষ্টি চিত্তে মেনে নেয়া ইত্যাদি ।

(খ) মৌখিক ইবাদতঃ যে সকল ইবাদতের সর্ম্পক মুখ ও কথার সাথে রয়েছে সেগুলোকে মৌখিক ইবাদত বলে। যেমন কুরআন তেলাওয়াত, যিকির, তাসবীহ তাহলীল, ওয়াজ নসিহত ও সত্যের আদেশ এবং মন্দের নিষেধ ইত্যাদি ।

(গ) দৈহিক ইবাদতঃ যে সকল ইবাদতের সম্পর্ক শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সাথে রয়েছে সেগুলোকে দৈহিক ইবাদত বলে। যেমন নামাজ, রোজা, হজ্জ ইত্যাদি ।

(ঘ) আর্থিক ইবাদতঃ যে সকল ইবাদতের সম্পর্ক অর্থ বা সম্পদের সাথে রয়েছে সেগুলোকে আর্থিক ইবাদত বলে। যেমন যাকাত, সদকাহ, নযর,মানত, হজ্জ ও কুরবানী ইত্যাদি ।

---

[1] সূরা নিসা, ৩৬ ।

[2] সূরা ইয়াসীন, ৬০ ।

আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদত দুই ভাবে হয়ে থাকেঃ
প্রত্যক্ষ ইবাদতঃ যা প্রকাশ্য উপলব্ধি করা যায় যেমন মূর্তি, কবর, মাজার, গাছ, আগুন, চন্দ্র, সূর্য ইত্যাদির ইবাদত করা।
নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেনঃ

أَللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلْ قَبْرِيْ وَثَناً يُعْبَدُ (رواه أحمد)

'হে আল্লাহ! আমার কবরকে তুমি এমন মূর্তির ন্যায় বানিয়ে দিওনা যার ইবাদত করা হয়। (আহমদ)
ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম বলতেনঃ

وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ . إبراهيم : ٣٥

'(হে আল্লাহ) আমাকে ও আমার বংশধরকে মূর্তির ইবাদত থেকে বিরত রাখ।'[1]
পরোক্ষ ইবাদতঃ
যা প্রকাশ্যে উপলব্ধি বা অনুভব করা যায় না। যেমন জিনের ইবাদত করা, শয়তানের ইবাদত করা, প্রবৃত্তির ইবাদত করা ইত্যাদি।
আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ . سورة سباء: ٤١

বরং তারা জিনদের পূজা করত।'[2]

وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ . المائدة : ٦٠

'যারা তাগুতের ইবাদত করেছে তারাই মর্যাদার দিক দিয়ে নিকৃষ্টতর এবং সত্য পথ থেকে অনেক দূরে।[3]

أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا . سورة الفرقان : ٤٣

'আপনি কি তাকে দেখেন না যে তার প্রবৃত্তিকে মাবুদ রূপে গ্রহণ করে? তবুও কি আপনি তার যিম্মাদার হবেন?'[8]
উপরোল্লিখিত আয়াতগুলিতে যথাক্রমে জিন, শয়তান ও প্রবৃত্তির ইবাদতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এখন প্রশ্ন হলো জিন, শয়তান ও প্রবৃত্তির ইবাদত কিভাবে সংঘটিত হয়? এগুলোকে দেখা যায় না, ধরা যায় না, স্পর্শও করা যায় না। এদের

---
[1] সূরা ইব্রাহিম, ৩৫।
[2] সূরা সাবা, ৪১।
[3] সূরা মায়েদা, ৬০।
[4] সূরা ফুরকান, ৪৩।

নেই কোন উপাসনালয়। এদেরকে সামনে রেখে রুকুও করা যায় না। সিজদাও করা সম্ভব নয়। তাহলে কিভাবে তাদের ইবাদত করা হয়।
জিন ও শয়তানের কু মন্ত্রনায় শরীয়ত বিরোধী কাজ করা তাদের ইবাদত করার শামিল। তেমনি শরীয়ত বিরোধী প্রবৃত্ত অনুসরণকে প্রবৃত্তির ইবাদত বলা হয়েছে। এ সম্পর্কে ইবনে আব্বাস রা. বলেছেনঃ শরীয়ত বিরোধী প্রবৃত্তিও এক প্রকার মূর্তি, যার পূজা করা হয়। তিনি এর প্রমাণ হিসাবে এই আয়াত তেলাওয়াত করেনঃ

أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ

'আপনি কি তাকে দেখেননি যে তার প্রবৃত্তিকে মাবুদ হিসারে গ্রহণ করেছে? (কুরতবী)
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

لاَ يُؤمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُوْنَ هَوَاهُ تَبْعاً لِمَا جِئْتُ بِهِ

'কখনই তোমাদের কেউ ঈমান আনতে পারবে না, যতক্ষণ না তার প্রবৃত্তি আমি যা নিয়ে এসেছি তার অনুসারী না হবে।' (কিতাবুল হুজ্জাহ)
অতএব আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লহু আলাইহিওয়া সাল্লামের আদেশ ও নিষেধের বিপরীতে কোন কাজ মনে চাইলেও করা যাবে না।
আলাউদ্দিন বুহাইছ তার কিতাবে[1] উল্লেখ করেছেন যে, বর্তমান জামানায় মুসলিমদের জীবনে বিভিন্ন ধরনের নতুন নতুন মাবুদ (যার ইবাদত করা হচ্ছে) ও মূর্তি প্রকাশ পেয়েছে যা মানুষের অন্তর দখল করেছে, আল্লাহর হুকুমের চেয়ে তাদের হুকুমকে প্রাধান্য দিচ্ছে।
জাতি আজ সংখ্যাগরিষ্ঠের হুকুম মেনে নিচ্ছে। অধিকাংশ লোক অথবা দেশের পার্লামেন্ট যদি মদ পান করা বৈধ বলে ঘোষণা দেয় তাহলে জনগণও তাকে বৈধ মনে করছে এবং সুদকে হালাল বলে ঘোষণা দিলে জনগণও তা হালাল বলে মেনে নিচ্ছে। এমনি ভাবে পার্লামেন্টে বসে যদি সংসদ সদ্যস্যরা মনে করে যে, আল্লাহর শরীয়ত বাস্তবায়ন করা যাবে না তাহলে তা বাস্তবায়িত হচ্ছে না। তাদের নীতি নির্ধানণীদের সর্বাবস্থায় হুকুম হচ্ছে সংখ্যাগরিষ্ঠের রায় বলবত করা। অথচ আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا للهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ .

سورة يوسف: ٤٠

[1] معبودات جديدة ص٦

'আল্লাহ ছাড়া কারও বিধান দেয়ার ক্ষমতা নেই। তিনি আদেশ দিয়েছেন যে, তিনি ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত করোনা। এটাই সরল পথ। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না।'[১]

আর বুঝতে পারছে না বিধায় এক জাতি অন্য জাতির ইবাদত করছে, এক দেশ অন্য দেশের ইবাদত করছে। কেউ করছে নেতার পূজা, আবার কেউ করছে দলের পূজা, আবার এক সরকার করছে অন্যদেশের সরকারের পুজা ইত্যাদি।

আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا . سورة الأحزاب: ٣٦

'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে ও কাজের আদেশ করলে কোন ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন ক্ষমতা ও সিদ্ধান্তের অধিকার নেই।'[২]

তিনি আরও বলেনঃ

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا . سورة النساء: ٦٥

'অতএব পালনকর্তার কাছে তারা কখনই ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে ন্যায় বিচারক বলে মনে না করে, অতঃপর তুমি যে বিচার করবে তা দ্বিধাহীন অন্তরে গ্রহণ না করে এবং ওটা সন্তুষ্ট চিত্তে কবুল করে।'[৩]

অতএব আসুন, আমরা শিরক ও বেদআত থেকে মুক্ত হয়ে আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসী হয়ে গোটা জীবনটাকে তাঁর বিধান দিয়ে পরিচালনার মাধ্যমে মানব সৃষ্টির রহস্য বাস্তবায়ন করি।

আল্লাহ আমাদের সবাই তাওফিক দান করুন।

তথ্য সংগ্রহঃ

١- القرآن الكريم

٢- الحديث النبوي

٣- كتاب يا أبناء الإسلام دينكم دين الحق

[1] সূরা ইউছুফ, ৪০।

[2] সূরা আহযাব,৩৬।

[3] সূরা নিসা, ৬৫।

٤- كتاب أيات الله في الآفاق
٥- كتاب الإسلام أو الضياع
٦- كتاب توحيد الخالق١-٣
٧- كتاب التوحيد ١-٣
٨- كتاب الإيمان
٩- كتاب طريق الإيمان
١٠- الخمر داء وليست بدواء-الدكتور شبيب بن علي الحاضري
١١- كتاب الصيام معجزة علمية —الدكتور عبد الجواد الصاوي
١٢- العبادة في الإسلام الدكتور يوسف القرضاوي
١٣- معبودات جديدة علاء الدين بحيص
١٤- كتاب منهاج المسلم الشيخ أبو بكر الجزائري
١٥- كتب التفاسير المختلفة
১৬- সুন্নাতে রাসূল ও আধুনিক বিজ্ঞান ডাঃ মুহাম্মদ তারিক মাহমুদ
১৭- যুক্তির কষ্টি পাথরে আল্লাহর অস্তিত্ব-খন্দকার আবুল খায়ের
১৮- বিবর্তনবাদ ও সৃষ্টিতত্ত্ব- মাওঃ মোঃ আব্দুর রহীম
১৯- আল্লাহর পরিচয় ও সৃষ্টি রহস্য -মোঃ আজিজুর রহমান সুফী
২০- আল্লাহর একত্ববাদ -নূরুল আমীন
২১- তাফসীর মাআরিফুল কুরআন মুফতী মোঃ শফী
২২- প্রজন্মের প্রহসন- মনির উদ্দীন আহমাদ
২৩- সুন্নাত ও বিজ্ঞান ডাঃ খন্দকার আব্দুল মান্নান
২৪- মাসিক মদীনা
২৫- মাসিক কাবার পথে
২৬- মাসিক সংস্কার
২৭- কুরআন হতে বিজ্ঞান- শাইখুল হাদীস আজিজুল হক
২৮- আল কুরআন দ্য চ্যালেঞ্জ - কাজী জাহান মিয়া
২৯- প্রাণী বিজ্ঞান- এ.জে. এম. শহীদুল্লহ এবং এ. এন. চৌধুরী
৩০- কুরআন এক বিস্ময়কর বিজ্ঞান- মুহাম্মদ শাহজাহান খান
৩১- ষ্টিফেন হকিং এর নাস্তিকতা ও ইসলাম -মোঃ সিদ্দিক

৩২- কুরআন সুন্নাহর আলোকে ইবাদত- মুহাম্মদ চৌধুরী ও আবদুস সালাম মাদানী

৩৩- তাওহীদের মর্মকথা - শাইখ আবদুর রহমান নাসের আস সাদি

৩৪- কুরআনে বিজ্ঞান - ডাঃ মুহাম্মদ গোলাম মুয়াযযাম

৩৫- বিভিন্ন দৈনিক ও মাসিক পত্রিকা